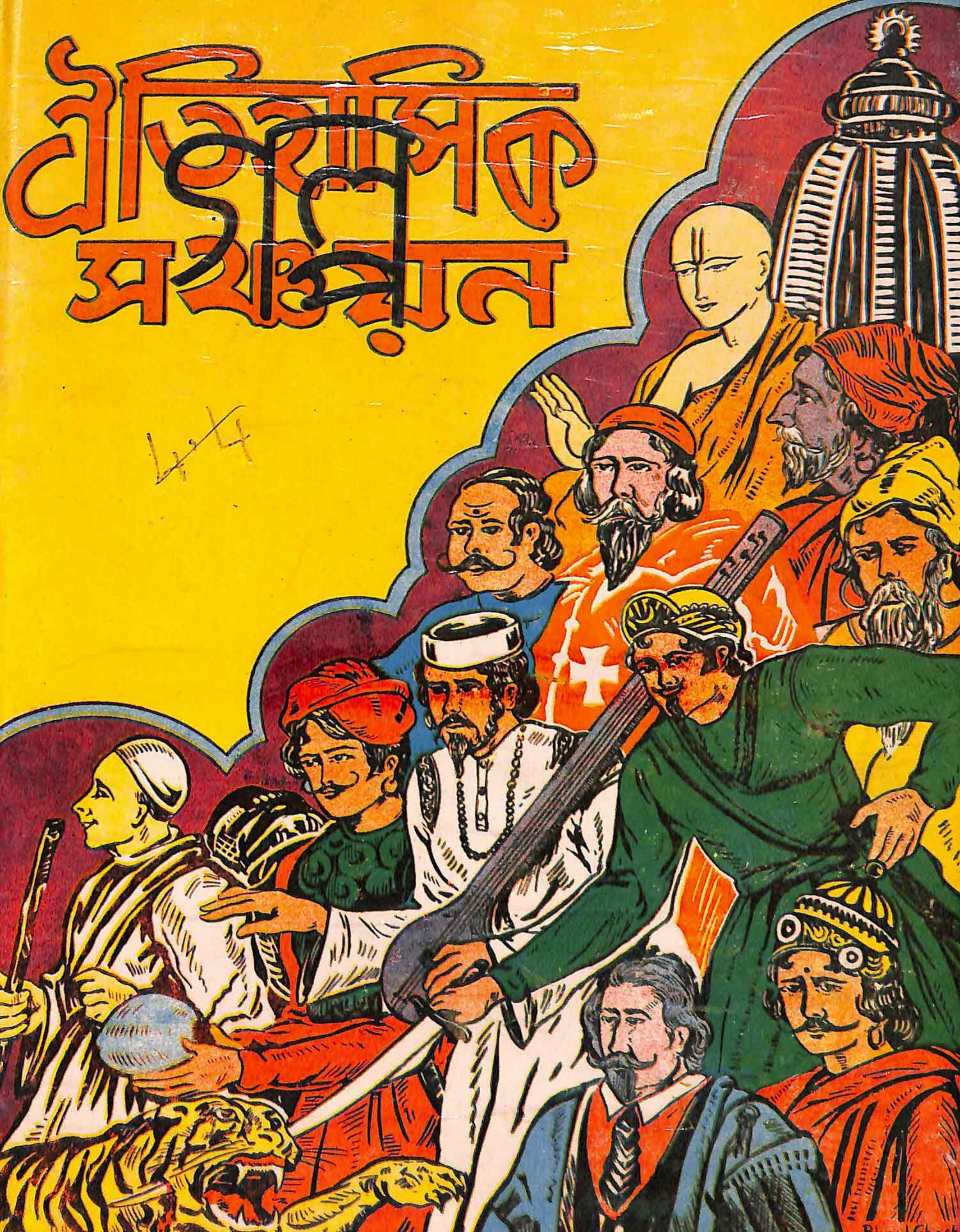
ঐতিহাসিক গল্প সঞ্চয়ন



ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সপ্তম মুদ্রণ, পৌষ ১৩৯৫
—বাইশ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১৯, গুলু ওস্তাগর লেন কলিকাতা-৬ হইতে জয়ন্ত বাকচি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

কথা কও, কথা কও!
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তা'রে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও॥

—রবীন্দ্রনাথ



ইতিহাসের স্বরূপ

সুরেন্দ্রনাথ সেন

রাজা, বাদশাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি লইয়া ইতিহাসের কারবার। রূপকথাতেও আমরা রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্রের গল্প শুনি। তবে কি ইতিহাস আর উপকথায় কোন পার্থক্য নাই ? ইতিহাসে আমরা যে সকল রাজা-রাণীর কথা পড়ি তাহারা সত্যকার মানুষ। উপকথার নায়কেরা কল্পনার জীব। বাস্তব জগতে তাহাদের স্থান নাই। আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে তাঁহারা কোনদিন পা ফেলেন নাই, আমাদের বাগানের ফুল উপকথার রাজকন্যারা কখনও খোঁপায় পরেন নাই। এই পৃথিবীর কোন আস্তাবলে কোনদিন পক্ষীরাজ ঘোড়া রাখিবার ব্যবস্থা হয় নাই। উপকথার রাজপুত্র মস্তবড় পাখীর পিঠে চড়িয়া একদিনে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যাইতে পারে। সত্যকার রাজা বা রাজপুত্রের সে সুবিধা সে শক্তি নাই ; এমন কি নিবিড় বনে, পুরাতন সরোবরের তীরে কোন অজগরের মাথার মাণিকের আলোতে অমানিশার অন্ধকারে পথ চলিবার সৌভাগ্য কোন ঐতিহাসিক রাজা বা রাজপুত্রের হয় নাই। তাঁহারা আমাদের মত মানুষ, আমাদের মতই পরিশ্রম করিলে তাঁহাদের ক্লান্তি হয়, আহারের অভাবে তাঁহারা কষ্টবোধ করেন, আপদে বিপদে কোন পরী, কোন জাদুকর তাঁহাদের সাহায্য করিতে আসে না।

আরব্য উপন্যাসে খলিফা হারুণ-আর-রসিদের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার রাজধানী বোগদাদ নগর এখনও বর্তমান ; কেশবতী রাজকন্যার বাপের বাড়ীর মত কাল্পনিক জায়গা নয়। হারুণ-আর-রসিদের বেগম ও উজীর আমাদের মতই পৃথিবীর জীব, রক্তমাংসের মানুষ। তাঁহারা হাসিলে মুক্তা ঝরিত না, কাঁদিলে হীরা পড়িত না। আমাদের মত তাঁহাদেরও কাতুকুতু দিলে তাঁহারা হাসিয়া ফেলিতেন, চিমটি কাটিলে বেদনা পাইতেন, মজার কথা শুনিলে কৌতুক বোধ করিতেন। তবে কি আরব্য উপন্যাস ইতিহাস ? না, আরব্য উপন্যাসও ইতিহাস নহে। খলিফা হারুণ-আর-রসিদ সত্যকার মানুষ হইলেও সেই তিন-বর্ণ মাছের দেশের রাজা, যাঁর শরীরের অর্ধেক পাথর হইয়া গিয়াছিল, তিনি কি আমাদের মত মানুষ ? তিন রঙ্গের মাছ এই কলিকাতার শহরে পুকুরে না হউক, চৌবাচ্চায় ও কাচের পাত্রে অনেক পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন জাদুকরের হুকুমেই তাহারা তপ্ত কড়াই হইতে মানুষের কথার জবাব দিতে পারিবে না। চালাকিতে আমাদের এই শহরের জেলেরাও কিছু কম যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সমস্ত বাজার ঘুরিলেও এমন একজন জেলের দেখা পাইবে না, যে তালগাছের মত মস্ত একটা দৈত্য কোন দিন জালে ফেলিতে

পারিয়াছে। বাঙ্গালা কেন, যদি বাস্তবিক তোমাদের কেহ কখনো বোগদাদ শহর ঘুরিয়া আসে তাহা হইলেও সেই দৈত্য-ধরা জেলের বা তাহার পরিচিত কোন লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ইতিহাসের প্রাণ সত্য। সত্য ঘটনা লইয়া ইতিহাস লেখা হয়। সত্য ঘটনাও উপকথার মত চমকপ্রদ হইতে পারে। এই তো এখন মানুষ কলের জাহাজে আকাশে বেড়াইতেছে। কিন্তু কোন সত্য ঘটনার সঙ্গে মিথ্যা মিলাইয়া দিলে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না, উপকথা হইয়া যায়। বাস্তব জগতের কোন সত্যকার মানুষের নাম অথবা জীবনী অবলম্বন করিয়া কতকগুলি আজগুবী অসম্ভব গল্প রচনা করিলে তাহা আরব্য উপন্যাস হইয়া দাঁড়ায়।

সত্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সত্যকে বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা মিথ্যা। মাণিক দশ বছরের ছেলে। সে দুই মাইল খুব জোরে ছুটিতে পারে। আমি যদি বলি, মাণিকের বয়স বারো, সে দশ মাইল অনায়াসে দৌড়াইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমি সত্যের অপলাপ করিয়া মিথ্যা বলিলাম। মাণিক নামে একটি ছেলে সত্য-সত্যই আছে, দৌড়াইতেও পারে; তাহার জীবনের ঘটনা হইতে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ও রকম মিথ্যা কথা ইতিহাসে স্থান পাইবে না।

আমাদের দেশে সেকালে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী কয়েকজন রাজা ছিলেন। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিও এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কালিদাসও ঐতিহাসিক ব্যক্তি, রাজা ভোজও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু যে-বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা ছিল, যিনি ভোজের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাল বেতাল নামক দুই অদ্ভুত শক্তিশালী অপদেবতা যাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, ইতিহাসে তাঁহার স্থান নাই। কারণ ভারতের গৌরব-স্থল নয় জন পণ্ডিত ও কবি এক সময়ে জীবিত ছিলেন না, এক জায়গায় বাস করিতেন না, ভোজ ও বিক্রমাদিত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহারা সমসাময়িক নহেন, সুতরাং ভোজের কন্যার পক্ষে বিক্রমাদিত্যের রাণী হওয়া অসম্ভব; তাল বেতাল প্রভৃতি অপদেবতার অস্তিত্ব এখনও প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং তাল বেতালের মালিক, ভোজের জামাতা ও নবরত্নের মুরুব্বি বিক্রমাদিত্যের স্থান হইয়াছে উপকথায়; আর ইতিহাসের কালিদাসের গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্যের কাল-নির্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

তবে অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেই কি কোন ঘটনা অসত্য বলিয়া ধরিতে হইবে, আর ইতিহাস হইতে তাহা বাদ দিতে হইবে? ইতিহাস যেমন বিনা প্রমাণে কোন কথা স্বীকার করে না, তেমনই বিনা প্রমাণে কোন কথা অস্বীকারও করে না। ঐতিহাসিকের কর্তব্য সত্য-নির্ণয়। চাক্ষুষ-প্রমাণ ইতিহাস সহসা অগ্রাহ্য করে না। আদালতে যেমন শোনা কথার কোন মূল্য নাই, ইতিহাসেও তেমনই চাক্ষুষ-প্রমাণ কানের প্রমাণের চেয়ে বড়। একটা লোককে চল্লিশ দিন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবার পরও সে জীবিত ছিল একথা বলিলে কি তোমরা বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস হউক বা না হউক, সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা না করিয়া ঐতিহাসিক এই রকমের কথা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন না। শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের একজন ফিরিঙ্গি চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার নাম হনিবার্গার। তিনি লিখিয়াছেন যে, রণজিতের রাজত্বকালে পাঞ্জাবে হরিদাস নামক একজন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি দেহের সমস্ত রন্ধ্র নিরোধ করিয়া চল্লিশ দিন মড়ার মত পড়িয়া থাকিতেন। এই সময় মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেও তাঁহার মৃত্যু হইত না। রণজিৎ নাকি সত্য-সত্যই

তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া সিন্দুকে পুরিয়া মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। চল্লিশ দিন পরে বহুলোকের সাক্ষাতে সিন্দুক তোলা ও খোলা হইলে দেখা গেল সাধুর দেহ নষ্ট হয় নাই। কিছুকাল পরে আবার তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হইল। ঐতিহাসিক এই ঘটনা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কারণ সেনাপতি ভেন্তুরা ও রাজা ধ্যান সিংহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শী এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মিথ্যা বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

সুতরাং ঐতিহাসিক স্বীকার করিবেন যে, সাধারণ মানুষ এতদিন শ্বাস বন্ধ করিয়া বাঁচিতে না পারিলেও দুই-একজন লোকের এরূপ অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে। অপর পক্ষে একজন মুসলমান বাদশাহ ও এক হিন্দু তাপসীর সাক্ষাৎ হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয় না। ভক্তমাল গ্রন্থে লেখা আছে যে, সম্রাট আকবর প্রসিদ্ধ রাজপুত তাপসী মীরাবাঈ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভক্তমালের গ্রন্থকার নিজে আকবর ও মীরাবাঈ-এর সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথবা এই ঘটনার কথা কোন প্রত্যক্ষদ্রষ্টার নিকটও শ্রবণ করেন নাই। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। আকবর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বাদশাহ, একসময় বাদশাহ বলিলে আকবরের কথাই লোকের মনে হইত। সুতরাং আকবরের সম্বন্ধে প্রচলিত সকল গল্প বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা যায় না। আকবরের জন্ম-তারিখের সহিত মীরাবাঈ-এর মৃত্যু-তারিখের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয়ের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। অতএব ভক্তিগ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও এবং প্রচলিত প্রবাদ তাহার সমর্থন করিলেও ইতিহাস তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এক কথায়, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও সাধু হরিদাসের অসাধারণ ক্ষমতার কাহিনী অনৈতিহাসিক নহে, কিন্তু বাদশাহ আকবর ও তাপসী মীরাবাঈ-এর সাক্ষাতের গল্প বহু ভক্তের বিশ্বাস সত্ত্বেও নিতান্তই অনৈতিহাসিক।

সত্য ইতিহাসের প্রাণ হইলেও কেবল সত্য ঘটনার সময়ানুগত তালিকাকে ইতিহাস বলা চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলে যে বস্তুর উদ্ভব হয় তাহা আখ্যান। ঐতিহাসিক সর্বদাই কার্যকারণের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্রে শাহজী দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শিবাজীও মুসলমান সম্রাটের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুদ্ধে শাহজী পরাজিত হইয়াছিলেন, শিবাজী জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বন করিয়া গল্প ও উপন্যাস রচনা করা যাইতে পারে, আবার ইতিহাসও লেখা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিক তাঁহার গ্রন্থের আখানভাগ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, দুই একটি কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ করিবেন, দুই চারিটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিবেন। ঐতিহাসিক কাল্পনিক ঘটনা অথবা কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিলে ইতিহাস মাটি হইবে। তিনি সমসাময়িক কাগজপত্র লইয়া বিচারে বসিবেন। প্রত্যেক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

শাহজী ও শিবাজী একই কারণে অথবা একই উদ্দেশ্যে মুসলমান নরপতিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা ঔপন্যাসিকের না বলিলেও চলে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট তাহাই হইল প্রকৃত বিচার্য বিষয়। যদি পিতা ও পুত্রের উদ্দেশ্য অভিন্ন না হয় তাহা হইলে ঐতিহাসিককে বলিতে হইবে শাহজী কেন মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিবাজীই বা কি অভিপ্রায়ে বিজাপুর ও দিল্লীর নরপতিগণের

সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিককে শাহজীর পরাজয়ের ও শিবাজীর বিজয়ের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। শাহজীর পরাজয়ই মুখ্য অথবা গৌণ ভাবে শিবাজীর বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকের নীরব থাকিলে চলিবে না। মোট কথা, কেবল কোন ঘটনার উল্লেখ করিলেই ঐতিহাসিকের কর্তব্য সমাধা হইবে না,—সেই ঘটনা কবে, কোথায়, কেন ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ করিতে হইবে। ঔপন্যাসিক তাঁহার মন্তব্যের জন্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে বাধ্য নহেন। তিনি বলিয়া খালাস যে, বোগদাদের এক মৎস্যজীবীর জালে একদা একটি কলসী উঠিয়াছিল। আর সেই স্বল্পায়তন পাত্রের ভিতরে একটি বিরাট দৈত্য বন্দী হইয়া ছিল। সে তাহার প্রকাণ্ড অবয়ব বাষ্পে পরিণত করিয়া অতি ক্ষুদ্র কলসীতেও প্রবেশ করিতে পারিত এবং সেই অবস্থায় শতাধিক বর্ষ সমুদ্রের গর্ভেও জীবিত থাকিতে পারিত। তোমার ভাল লাগে গল্প শুনিবে, ভাল না লাগে শুনিবে না। কিন্তু তাঁহাকে জেরা করিবার অধিকার তোমার নাই। তাঁহার নিকট প্রমাণ দাবী করিতে তুমি পারিবে না। অপর পক্ষে, বিনা প্রমাণে কেহ ঐতিহাসিকের একটি কথাও গ্রহণ করিবে না। তিনি যদি বলেন ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী শিবনের নামক কেল্লায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার প্রমাণ চাহিতে পারি। তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দেই শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল, ১৬৩০ অথবা ১৯৩০ সালে হয় নাই। শিবনের কেল্লাতেই তিনি প্রসূত হইয়াছিলেন, কলিকাতা তাঁহার জন্মস্থান নহে।

তবে কি ইতিহাসে আদৌ কল্পনার স্থান নাই? একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না। বাদশাহের রাজধানীতে বন্দী হইয়া শিবাজীর মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার কোন সমসাময়িক বিবরণ নাই, কিন্তু ঐ অবস্থায় তাঁহার মনোভাব কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে। এ রকম অবস্থায় ঐতিহাসিক সময় সময় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তবে আরব্য উপন্যাসের গ্রন্থকারের মত ঐতিহাসিকের কল্পনা নিরঙ্কুশ নহে। ঐতিহাসিকের কল্পনা সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই যুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ। স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিক তাঁহার কল্পনার গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। শিবাজী প্রয়োজন হইলে চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেন না, কিন্তু মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের পক্ষে কোন প্রকারের ছলনার বশবর্তী হওয়া সম্ভব ছিল না। এই দুই মহাপুরুষের কোন কার্য কল্পনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ঐতিহাসিক কখনও তাঁহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইবে না। এইজন্য ঐতিহাসিকের কেবল পোকায় কাটা পুরাতন কাগজ ঘাঁটিলেই চলে না, মনুষ্য-চরিত্রও অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিতে হয়।

মোট কথা, ইতিহাসে গল্পের উপাদান আছে। কিন্তু গল্প বা আখ্যান ইতিহাস নহে। সত্য ঘটনার সমষ্টিতে আখ্যান রচিত হইতে পারে, কিন্তু আখ্যানের সহিত যুক্তির যোগ না থাকিলে ইতিহাস হয় না।



প্রাচীন বাংলার দুটি কাহিনী

দীনেশচন্দ্র সেন

ত্রিপুরাধিপতি ছেংথোম্পা রাজার সময়ে গৌড়ের রাজার এক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা-রাজ্যের দক্ষিণাংশ লুণ্ঠনাদি করিতে উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ গৌড়েশ্বরের দুই তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া ছেংথোম্পার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ত্রিপুররাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বীয় কাপুরুষ স্বামীকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিতে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহবাক্যে ত্রিপুর-সৈন্যেরা জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি ত্রিপুর-সৈন্যদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল॥
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে। যেই জন বীর হও চল আমা সনে॥

(রাজমালা—ছেংথোম্পা খণ্ড)

তাঁহাদের অনুকূল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাদেবী স্বয়ং রন্ধনকার্যের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়া মহিষ, গরু, মেষ, হংস, হরিণ নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য শূকর প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, "সহস্র সহস্র মদ্যের কলস ও দধি-দুগ্ধাদির ভাণ্ড" আনীত হইল এবং ত্রিপুরায় কুকি ও রাজসৈন্য একত্র হইয়া মহারাজ্ঞীর এই খাদ্যসম্ভার উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল। মহারাজ্ঞীর রণবেশ ও উগ্রচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া অগত্যা রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল। হীরাবন্ত খাঁর খড়্গের কোষ স্বর্ণনির্মিত ছিল এবং মাথায় সোনার পাগড়ী এবং অঙ্গে সোনার "জীরা" (বর্ম) ঝলমল করিতেছিল। ত্রিপুরা সৈন্য মহারাজ্ঞীর নেতৃত্বে দুর্জয়বেগে গৌড়সৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং হীরাবন্ত খাঁয়ের রাজবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকেই জোরে আক্রমণ চালাইল। গৌড়সৈন্য পরিণামে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। কথিত আছে, এই মহাযুদ্ধে একলক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ আকাশে নাচিতেছে, একদণ্ড নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশায়ী হইল। একলক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্রে একটি কবন্ধ দেখা দেয়। রাজা বুঝিলেন এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। ভীরু রাজা চোখে সরিষা ফুল দেখিয়াছিলেন, কিম্বা কবন্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না।

যুদ্ধ জয় করিয়া ছেংথোম্পা সেই হতাহত সৈন্য-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে একতিল স্থান বসিবার উপযোগী পাইলেন না। তখন তাঁহার জামাতা রণে পতিত এক অতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয় খড়গাঘাতে কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। রাজা জামাতার বিক্রম দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং জামাতাকে সম্মানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রের সঙ্গে ত্রিপুরায় রাজ-জামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং জামাতারা সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য রাজসরকারের দৈনিক একসের মাত্র চাউল বরাদ্দ ছিল। ত্রিপুরাসুন্দরী জোয়ান ছ' আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এই যুদ্ধ বারোশ' চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুবর্ণগ্রামের কোন রাজা।

পতি-ঘাতিনী সতী

বন-বিষ্ণুপুরে রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মোগলদের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক শোভাসিংহ ও রহিম খাঁকে পরাস্ত করেন। শোভাসিংহের কন্যাকে তিনি পাটরাণী করেন এবং মৃত রহিম খাঁর পত্নী লালবাঈকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমণী অনিন্দ্য-সুন্দরী, সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সুধাকণ্ঠী ছিলেন। রাজা ইঁহার অনুরাগে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দেশপূর্বক তাঁহার নামানুসারে লালবাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। রাজা দিন-রাত লালবাঈ-এর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহাবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লালবাঈ-এর সঙ্গে মুসলমানী খানা খাইতেন,—রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোন খোঁজ-খবর লইতেন না ; মন্ত্রীরাই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক সর্বনাশের ব্যাপার ঘটিল। লালবাঈ রাজাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; শুধু তাহাই নহে, রাজ্যসুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীদিগকে মুসলমান হইতে হইবে—এই আব্দার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি সত্ত্বেও এবংবিধ সর্বনাশকর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং বিনয়ের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর পাইয়াছিল, সে তাহার নিজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া একটা অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রাজা যদি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে সে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। রাজা অকুল চিন্তা-সাগরে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং অবশেষে লালবাঈ-এর আব্দার রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষ্ণুপুরের শ্মশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও ভোজনতলা বলিয়া যে স্থানটি বিদ্যমান, তথায়ই রাজ্যসুদ্ধ সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির আহারের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের শত সহস্র নরনারী আতঙ্কিতভাবে তথায়

উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল—সেই নিমন্ত্রণ যিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এদিকে রাজপরিবারে গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গোপাল সিংহ ও মহারাজ্ঞী স্বয়ং রাজার প্রধান মন্ত্রীদিগকে লইয়া পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালবাঈ-এর তত্ত্বাবধানে মুসলমানী খানা পরিবেশনের আয়োজন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজ্ঞীর হস্তনিক্ষিপ্ত এক বাণ বাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাঈকে পরে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দীঘিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি মুসলমানী ভোজনপাত্র ও একটা নরকঙ্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের নূরজাহান—লালবাঈ-এর ইহাই কি পরিণাম ও শেষ চিহ্ন ?

মহারাজ্ঞী স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর লালবাঈ-এর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইল। রাজা ও মহারাজ্ঞী যে স্থানে একত্র দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। এই রাজ্ঞীকে লোকে "পতি-ঘাতিনী সতী" আখ্যা দিয়াছিল। রাজার কল্যাণার্থ এবং ধর্মের জন্য তিনি প্রাণপ্রিয় পতিকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাই একাধারে সতী ও পতিঘাতিনী বটেন।



চৈতন্যদেব ও প্রতাপরুদ্র

বিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীচৈতন্য যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর, তেমন উড়িয়াদের উপাস্য দেবতা। উড়িয়াদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচারে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রতাপরুদ্র। প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরী বা নীলাচলে গমন করেন, তখন প্রতাপরুদ্রের রাজ্যাধিরোহণের পর তের বৎসর গত হইয়াছে। প্রতাপরুদ্র তাঁহার পিতা পুরুষোত্তমদেবের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ সাম্রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত ও পূর্বে হুগলী জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতাপরুদ্রকে দক্ষিণের বিজয়নগরাধিপতি ও কুলবর্গ বা গুলবর্গার সুলতানদের আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। আবার বাঙ্গালার সুলতান হুসেন শাহও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতাপরুদ্র শান্তি পান নাই। শ্রীচৈতন্যের কৃপাতে তিনি আনন্দলোকের আস্বাদ পাইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন পর্যন্ত ধরাধামে বর্তমান ছিলেন। প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনের ৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সময় হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা পর্যন্ত ৮২ বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সাতখানি পূর্ণাবয়ব জীবনী রচিত হয়। এই সাতখানি জীবনীতেই শ্রীচৈতন্য কি করিয়া প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সাতখানা বইয়ের বিবরণ ঠিক একরকম নহে। এই বিভিন্ন বিবরণ কয়টি মিলাইয়া পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে কিরূপে ঐতিহাসিক গল্পের সৃষ্টি হয়।

শ্রীচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্রের মিলন-কাহিনী সর্বাপেক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতে। ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত বর্ণনা তোমাদিগকে শুনাইয়া পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ববর্তী লেখকদের বর্ণনার সহিত উহার তুলনা করিব।

শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীতে গমন করেন, তখন প্রতাপরুদ্র পুরী বা তাঁহার রাজধানী কটকে ছিলেন না। বৃন্দাবন দাস বলেন,

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে অতএব প্রভু না দেখিলেন সেই বারে॥ (চৈঃ ভাঃ ৩।৩)

শ্রীচৈতন্য পুরীতে কয়েকদিন বাস করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপাধিধারী সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে স্বমতে আনিলেন। তারপর তিনি দুই বৎসরকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে একদিন প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে ডাকাইয়া কহিলেন—

শুনিলা তোমার ঘরে এক মহাশয়। গৌড় হইতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমার বহুকৃপা কৈলা—কহে সর্বজন। কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে—যে শুনিলে, সেই সত্য হয়। তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জনে। স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে॥
(চৈঃ চঃ ২।১০।৪-৭)

শ্রীচৈতন্য রাজা বা বড়লোকদের সঙ্গে দেখা করেন না শুনিয়াও প্রতাপরুদ্র নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি সার্বভৌমকে ধরিলেন যে, প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিলে একবার তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিতেই হইবে। সার্বভৌম রাজাকে বলিয়া প্রভুর জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীতে বাসা ঠিক করিয়া রাখিলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া দেশবিদেশের কতশত সাধু ভক্তকে দর্শন দিয়া কৃপা করিলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে পাইতেছেন না।

একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু! যদি অভয় দেন, তবে একটি কথা নিবেদন করি।" প্রভু বলিলেন—"ভয় কি? বলুন না! অনুরোধ সঙ্গত হইলে রাখিব, না হইলে নয়।" সার্বভৌম বলিলেন—"এই প্রতাপরুদ্র রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া আপনার দর্শন চায়।" প্রভু এই কথা শুনিয়াই কানে হাত দিলেন—নারায়ণ স্মরণ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি সন্ন্যাসী মানুষ। রাজদর্শন আর স্ত্রী-দর্শন আমার কাছে বিষ খাওয়ার মতন।" সার্বভৌম তথাপি ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন—"আপনার কথা সত্য। কিন্তু প্রতাপরুদ্র তো শুধু রাজা নহেন। তিনি জগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত।" এ যুক্তিতেও মহাপ্রভুর মন গলিল না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিষয়ী ব্যক্তির মুখদর্শন করিবেন না; এদিকে রাজাও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। রাজা কটক ছাড়িয়া পুরীতে আসিলেন। সার্বভৌমকে ডাকাইয়া বলিলেন—

মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন? সার্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন॥
তথাপি না করে তেঁহো রাজদরশন। ক্ষেত্র ছাড়ে—পুন যদি করি নিবেদন॥
শুনিয়া রাজার মনে দুখ উপজিল। বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। (শুনি) জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার॥

"প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত উদ্ধার"। এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা—না করিব রাজদরশন। মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন। কিবা রাজ্য কিবা দেহ—সব অকারণ ॥ ২।১১।৩৩-৩৯

রাজার অনুরাগ ও দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া সার্বভৌম বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রভুর কৃপা পাইবার এক উপায় প্রতাপরুদ্রকে বলিয়া দিলেন। রথযাত্রার দিনে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন। সেই সময় প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ব্যক্তির মত রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে যেন প্রভুর চরণ ধরেন। সে সময় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না; তিনি তাঁহাকে বৈষ্ণব ভাবিয়া আলিঙ্গন করিবেন। এই যুক্তি প্রতাপরুদ্রের মনে লাগিল। তিনি রথযাত্রার জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রথযাত্রার দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তগণসঙ্গে শ্রীবিগ্রহের রথারোহণ দেখিতেছেন এমন সময় রাজা স্বয়ং সুবর্ণমার্জনী লইয়া পথে সম্মার্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুশী হইলেন।

রথ চলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য রথের সম্মুখে প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য ও অলৌকিক প্রেমাবেশ দেখিয়া সকল লোক ধন্য ও কৃতার্থ হইল। নাচিতে নাচিতে তিনি প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পড়িলেন।

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল। তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল ॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার। ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার ॥

তারপর প্রভু রথের সহিত নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা। নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা। পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥
২।১৩।১৯৩-৯৪

মহাপ্রভু উপবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় সার্বভৌমের উপদেশ অনুসারে রাজবেশ ছাড়িয়া একলা প্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। রাজা তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন; আর রাসলীলার শ্লোক পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বুলি উচ্চ বোলে বারবার ॥
'তব কথামৃত' শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥
'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন ॥'

ইহার পর শ্রীচৈতন্য বলিলেন,—"কে তুমি আমার এমন উপকার করিলে? সহসা আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে?" রাজা বলিলেন,—"আমি তোমার দাসের দাস অনুদাস, তোমার ভৃত্যের ভৃত্য কর আমাকে—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল। 'কাঁহা না কহিও ইহা' নিষেধ করিল ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ। অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস ॥ ১।১৪।১৭-১৮

শ্রীচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্রের মিলন-কাহিনী পড়িয়া একটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকেরা সাধারণত রাজারাজড়াকে স্বধর্মে আনিবার জন্য কত চেষ্টা করেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সেণ্ট আগস্টাইনের সময় হইতে অষ্টম হেন্রীর সময় পর্যন্ত রাজাদের আশ্রয়ে ও সাহায্যেই ধর্মপ্রচারকগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য রাজসংসর্গ যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার মনে ধনজন ও যশের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিয়াই শত সহস্র লোক--ধনী দরিদ্র—তাঁহার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হিন্দু-রাজ্যের অধিপতি প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিয়া প্রেমধর্ম দান কবিয়াছিলেন ইহাতে সমগ্র বাঙালী জাতি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। আজ উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। এই স্বতন্ত্রীকরণের অন্যতম নেতা পার্লাকেমিডির রাজা সেদিন বলিয়াছেন—"উড়িয়ারা এখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুবর্তী। উত্তর দেশের মহাসাধু শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্বকালে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রচার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট মুসলমান, শিখ, পাঞ্জাবী, জাঠ, নেপালী অথবা বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোক সমান। তাঁহার ভক্তজনের মধ্যে মুসলমান আছেন; তাঁহারা বেশ নিষ্ঠাবান ও উচ্চস্থানীয়। আমরা উড়িয়ারা সেই মতাবলম্বী, আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চক্ষু দিয়া দেখিয়া থাকি।" —শ্রীচৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ একজন উড়িয়া নেতার মুখে আমরা এমন মহান্ বাণী শুনিতেছি।





শিবাজীর পলায়ন

যদুনাথ সরকার

[শিবাজীর সঙ্গে মুঘলদের প্রথম যে সন্ধি হয় তাহার ফলে শিবাজী জয়সিংহের সহিত আগ্রায় আসেন ও সম্রাট আওরংজীবের দরবারে যান। সেখানে তাঁহার অপমানকর অভ্যর্থনা হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন এবং সে ক্রোধ স্পষ্টই প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার পর সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে সোজাসুজি নজরবন্দী করা হয়। বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে এই বিপদের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা অনুভব করিয়া শিবাজী ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রথমটা অভিভূত হইয়া পড়িলেন।]

কিন্তু বেশীদিন এইভাবে গেল না। শিবাজীর অদম্য সাহস ও প্রখর বুদ্ধি শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। তিনি নিজের মুক্তির পথ নিজেই বাহির করিলেন। প্রথমত তিনি সকলের কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইতে লাগিলেন যে তিনি বাদশাহের ভক্ত প্রজা, তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে কাঁপিতেছেন। অপরাধ মার্জনা লাভের আশায়, বাদশাহের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য শিবাজী দরবারের অনেক সভাসদ্‌কে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজ রক্ষী সৈন্যদলকে দেশে পাঠাইবার অনুমতি চাহিলেন; বাদশাহ ভাবিলেন, ভালই তো, আগ্রায় যত শত্রু কমে। সৈন্যেরা মহারাষ্ট্রে গেল, সেই সঙ্গে শিবাজীর সঙ্গীরাও অনেকে দেশে ফিরিল। শিবাজী এখন একা—তিনি নিজের পলায়নের পথ নিজেই দেখিলেন।

অসুখের ভান করিয়া তিনি শয্যায় আশ্রয় লইলেন; ঘর হইতে আর বাহির হন না। ব্যাধি দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সাধুসজ্জন ও সভাসদ্‌দিগের মধ্যে তিনি প্রত্যহ বড় বড় ঝুড়ি ভরিয়া ফল ও মিঠাই বিতরণ করিতে শুরু করিলেন। প্রত্যেক ঝুড়ি বাঁশের বাঁকে ঝুলাইয়া দুজন করিয়া বাহক বৈকালে বাসাবাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। কোতোয়ালের প্রহরীরা প্রথমে দিনকতক ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তাহার পর বিনা পরীক্ষায় যাইতে দিতে লাগিল।

শিবাজী এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৯শে আগস্ট বৈকালে তিনি প্রহরীদের বলিয়া

পাঠাইলেন যে তাঁহার অসুখ বাড়িয়াছে, তাহারা যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। এদিকে ঘরের মধ্যে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিরাজী ফরজন্দ—দেখিতে কতকটা শিবাজীর মতই—শিবাজীর খাটিয়ায় শুইয়া, চাদরে গা-মুখ ঢাকিয়া, শুধু ডান হাত বাহির করিয়া রাখিলেন; তাঁহার এই হাতে শিবাজীর সোনার বালা দেখা যাইতেছিল। আর সন্ধ্যার সময় শিবাজী ও শম্ভুজী দুইটি ঝুড়ির মধ্যে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিলেন, তাঁহাদের উপর বেশ করিয়া পাতা ঢাকা দেওয়া হইল; আর তাঁহাদের বাঁকের সামনে ও পিছনে কয়েক ঝুড়ি সত্যকার ফল ও মিঠাই ভরিয়া সারিবন্দী হইয়া বাহকগণ বাসা হইতে বাহির হইল; বাদশাহের প্রহরীরা কোনই উচ্চবাচ্য করিল না,—কেন না ইহা তো নিত্যকার ঘটনা।

আগ্রা শহরের বাহিরে পেঁছিয়া একটি নির্জন স্থানে ঝুড়ি নামাইয়া বাহকগণ মজুরি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর শিবাজী ও শম্ভুজী ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া সঙ্গে যে দুটি মারাঠা অনুচর আসিয়াছিল তাহাদের সাহায্যে তিনক্রোশ পথ হাঁটিয়া একটি ছোট গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার ন্যায়াধীশ নিরাজী রাবজী ঘোড়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে মারাঠাদের দল দুইভাগে বিভক্ত হইল। পুত্র শম্ভুজী, নিরাজী, দত্তাজী ত্র্যম্বক (ওয়াকিয়ানবিস্) ও রাঘব মিত্রকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া সারা অঙ্গে ছাই মাখিয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন, বাকী সকলে দাক্ষিণাত্যের পথ ধরিল।

আগ্রায় শিবাজীর পলায়নের সংবাদ প্রকাশ হইল

এদিকে আগ্রায় ১৯শে আগস্টের সারারাত্রি এবং পরদিন তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত হিরাজী শিবাজীর বিছানায় শুইয়া রহিলেন। প্রাতে প্রহরীরা আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল,—সোনার বালা পরিয়া বন্দী শুইয়া আছেন, চাকরেরা তাঁহার পা টিপিতেছে। বৈকালে তিনটার সময়ে হিরাজী উঠিয়া নিজ বেশ পরিয়া চাকরটিকে সঙ্গে লইয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলেন; দরজায় প্রহরীদের বলিলেন, "শিবাজীর মাথার বেদনা; কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দিও না, আমি ঔষধ আনিতে যাইতেছি।" এইরূপে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রহরীরা দেখিল, বাড়ীটি যেন কেমন খালি খালি ঠেকিতেছে; ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন নড়াচড়ার চিহ্ন দেখা যাইতেছে না; অন্য দিনের মত বাহিরের লোকজনও কেহ দেখা করিতে আসিতেছে না। ক্রমে তাহাদের সন্দেহ বাড়িল, তাহারা ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের চক্ষু স্থির!—পাখী উড়িয়াছে, ঘরে জনমানব নাই!!!

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া কোতোয়ালকে সংবাদ দিল। ফুলাদ খাঁ কয়েদীর বাসায় খোঁজ করিয়া দেখিয়া বাদশাহকে জানাইল, "হুজুর! শিবাজী পালাইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য আমাদের কোন দোষ নাই। রাজা কুঠুরীর মধ্যেই ছিলেন। আমরা ঠিকমত গিয়া দেখিতে ছিলাম; তথাপি একেলা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি মাটির মধ্যে ঢুকিলেন, অথবা আকাশে উড়িয়া গেলেন, বা হাঁটিয়া পালাইলেন তাহা জানা গেল না। আমরা কাছেই ছিলাম; দেখিতে দেখিতে তিনি আর নাই! কী যাদুবিদ্যায় এমনটা হইল বলিতে পারি না।"

কিন্তু আওরংজীব এসব বাজে কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। অমনি চারিদিকে "ধর ধর" শব্দ

উঠিল, রাজ্যমধ্যে পথঘাটের সব চৌকি, পার-ঘাট এবং পর্বতের ঘাঁটিতে হুকুম পাঠানো হইল যেন দাক্ষিণাত্যের যাত্রীদের সকলকে ধরিয়া দেখা হয় তাহাদের মধ্যে শিবাজী আছে কিনা। এই হুকুম লইয়া দক্ষিণ দিকে কত সওয়ার ছুটিল। আর আগ্রা বা তাহার নিকটে শিবাজীর যত অনুচর ছিল (যেমন ত্র্যম্বক, সোনদের দবীর এবং রঘুনাথ বল্লাল কোরডে), তাহাদের ধরিয়া কয়েদ করা হইল। মারের চোটে তাহারা বলিল যে, রামসিংহের সাহায্যে শিবাজী পালাইয়াছেন। বাদশাহ রাগিয়া রামসিংহের দরবারে আসা বন্ধ করিলেন এবং মন্‌সব্ ও বেতন কাড়িয়া লইলেন।

শিবাজীর পলায়নের সময়ের নানা আশ্চর্য ঘটনা

চতুর-চূড়ামণি শিবাজী দেখিলেন, আগ্রা হইতে মহারাষ্ট্রের পথ দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে গিয়াছে, সুতরাং সেদিকে সর্বত্রই শত্রু সজাগ হইয়া পাহারা দিবে। কিন্তু উত্তর-পূর্বদিকের পথে কোন পথিকের উপরই সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। সেইজন্য তিনি আগ্রা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে উত্তরে, পরে পূর্বদিকে—অর্থাৎ ক্রমেই মহারাষ্ট্র হইতে অধিক দূরে চলিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রিতে ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহারা দ্রুতগতিতে মথুরায় পৌঁছিলেন ; কিন্তু দেখিলেন যে, বালক শম্ভুজী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; পথ চলিতে একেবারে অক্ষম। আগ্রার এত নিকটে থাকা শিবাজীর পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। নিরাজী পণ্ডিত তখন পেশোয়ার শ্যালক তিনজন মথুরাবাসী মারাঠা ব্রাহ্মণকে শিবাজীর আগমন ও দুর্দশার কথা জানাইয়া সাহায্যভিক্ষা করিলেন। তাঁহারাও দেশ ও ধর্মের নামে বাদশাহের শাস্তির ভয় তুচ্ছ করিয়া শম্ভুজীকে নিজ পরিবারের মধ্যে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। আর তাঁহাদের এক ভাই শিবাজীকে সঙ্গে লইয়া কাশী পর্যন্ত পথ দেখাইয়া চলিলেন।

এই দীর্ঘ পথের খরচের জন্য শিবাজী প্রস্তুত হইলেন। সন্ন্যাসীর লাঠির মধ্যে ফুটা করিয়া তাহা মণি ও মোহর দিয়া পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। জুতার মধ্যে কিছু টাকা রাখিলেন, আর একটা বহু মূল্য হীরক এবং অনেকগুলি পদ্মরাগমণি মোম দিয়া ঢাকিয়া তাঁহার অনুচরদের জামার ভিতর সেলাই করিয়া দিলেন, কিছু কিছু তাহারা মুখে পুরিয়া রাখিল।

মথুরায় পৌঁছিয়া দাড়ি গোঁফ কামাইয়া, গায়ে ছাই মাখিয়া, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শিবাজী পথ চলিতে লাগিলেন। নিরাজী ভাল হিন্দী বলিতে পারিতেন। তিনি মোহন্ত সাজিয়া দলের আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তিনিই পথের লোকজনদের প্রশ্নের উত্তর দেন ; শিবাজী সামান্য চেলা লইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলেন। তাঁহারা প্রায়ই রাত্রে চলেন, দিনে নির্জন স্থানে বিশ্রাম করেন, প্রত্যহই এক ছদ্মদেশ বদলাইয়া আর এক রকম বেশ ধরেন। তাঁহার চল্লিশ জন অনুচর তিনটি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া দূরে দূরে পশ্চাতে আসিতে লাগিল, প্রত্যেক দলেরই ভিন্ন ভিন্ন বেশ।

একবার তিনি ধরা পড়িয়াছিলেন। আলীকুলি নামে বাদশাহের এক ফৌজদার সরকারী হুকুম পাইবার আগেই আগ্রা হইতে নিজ সংবাদ-লেখকের পত্রে শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া তাহার সীমানার মধ্যে সমস্ত পথিকদের ধরিয়া তল্লাস আরম্ভ করিয়াছিল। শিবাজীও সদলে আটক হইলেন।

তিনি দুপুর রাত্রে গোপনে ফৌজদারের কাছে গিয়া বলিলেন,—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে এখনি এক লক্ষ টাকা দামের হীরা ও মণি দিব। আর যদি আমাকে বাদশাহের নিকট ধরাইয়া দাও, তবে এসব রত্ন তিনি পাইবেন,—তোমার কোনই লাভ হইবে না।" ফৌজদার এই ঘুষ লইয়া তখনি তাঁহাদের ছাড়িয়া দিল।

তারপর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—এলাহাবাদের পুণ্যক্ষেত্রে স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজী কাশীধামে পৌঁছিলেন। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, কেশচ্ছেদ প্রভৃতি তীর্থের ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রওনা হইবার পরই আগ্রা হইতে অশ্বারোহী দূত আসিয়া শিবাজীকে ধরিবার জন্য বাদশাহের আদেশ চারিদিকে প্রচার করিল। অনেক বৎসর পরে সুরতের নাভাজী নামে এক গুজরাটী ব্রাহ্মণ গল্প করিতেন,—"কাশীতে পাঠ্যাবস্থায় আমি এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলাম, গুরু আমার বড়ই খাবার কষ্ট দিতেন। একদিন ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই অন্যদিনের মত নদীর ঘাটে গিয়াছি, এমন সময় একজন লোক আমার হাতের মধ্যে মোহর ও মণি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "মুঠি খুলিও না, কিন্তু আমায় স্নানাদি তীর্থক্রিয়া যত শীঘ্র পার শেষ করাইয়া দাও।" আমি তাহার মাথা মুড়াইয়া স্নান করাইয়া দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম ; এমন সময়ে একদিকে শোরগোল উঠিল যে, পলাতক শিবাজীর খোঁজে আগ্রা হইতে বাদশাহের পুলিস আসিয়া ঢোল পিটিয়া দিতেছে। তাহার পর পূজার কাজে মন দিয়া যাত্রীটির দিকে ফিরিতেই দেখি, সে ইতিমধ্যে অন্তর্ধান করিয়াছে। মুঠির মধ্যে নয়টি মোহর, নয়টি মুক্তা ও নয়টি মণি পাইলাম। গুরুকে কিছু না বলিয়া সটান দেশে ফিরিলাম। ঐ টাকা দিয়া এই বড় বাড়ী কিনিয়াছি।"

কাশী হইতে গয়া পূর্বদিকে ; এই তীর্থ করিয়া শিবাজী দক্ষিণমুখে চলিলেন। পরে গোণ্ডওয়ানা ও গোলকুণ্ডা রাজ্য পার হইয়া পশ্চিম দিকে ফিরিয়া বিজাপুরের মধ্য দিয়া নিজদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া তিনি একটি টাট্টু (ছোট ঘোড়া) কিনিলেন ; দাম দিবার সময় দেখেন রূপার টাকা নাই, তখন ঘোড়াওয়ালাকে একটি মোহর দিলেন। সে বলিল—"তুমি বুঝি শিবাজী, নহিলে এই টাট্টুর জন্য এত বেশী দাম দিতেছ কেন?" শিবাজী থলি খালি করিয়া সব মোহরগুলি তাহাকে দিয়া বলিলেন, "চুপ! কথাটি কহিও না।" তারপর ঘোড়ায় চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পলাতক শিবাজী স্বদেশ পৌঁছিলেন

ক্রমে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে ইন্দুর-প্রদেশ পার হইয়া এই সন্ন্যাসীর দল মহারাষ্ট্রের সীমানার কাছে এক গ্রামে সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা গাঁয়ের মোড়লের স্ত্রীর (পাটেলিন) বাড়ীতে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় চাহিল। ইহার কিছুদিন আগেই আনন্দরাও-এর অধীনে শিবাজীর সৈন্যরা আসিয়া এই গ্রামের সব শস্য ও ধন লুট করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পাটেলিন উত্তর করিল, "বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। শিবাজীর সওয়ার আসিয়া সব শস্য লইয়া গিয়াছে। শিবাজী কয়েদ আছে। সেইখানে পচিয়া মরুক।"

বলিয়া সে তাহার উদ্দেশে কত অভিসম্পাত করিতে লাগিল। শিবাজী হাসিয়া নিরাজীকে ঐ গ্রামের ও তাহার পাটেলিনের নাম লিখিয়া লইতে বলিলেন। নিজ রাজধানীতে পৌঁছিবার পর পাটেলিনকে ডাকাইয়া লুটে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল তাহার বহুগুণ ধন দান করিলেন।

ক্রমে ভীমানদী পার হইয়া, আগ্রা হইতে রওনা হইবার পূর্ণ তিন মাস পরে, নিজ রাজধানী রাজগড়ে পৌঁছিলেন (২০শে নভেম্বর)। দুর্গের দ্বারে গিয়া জীজাবাঈকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, উত্তরপ্রদেশ হইতে একদল বৈরাগী আসিয়াছে—তাহারা সাক্ষাৎ করিতে চায়। জীজাবাঈ অনুমতি দিলেন। অগ্রগামী মোহন্ত (অর্থাৎ নিরাজী) হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু পশ্চাতের চেলা বৈরাগী জীজাবাঈ-এর পায়ের উপর মাথা রাখিল। তিনি আশ্চর্য হইলেন, সন্ন্যাসী কেন তাঁহাকে প্রণাম করে? তখন ছদ্মবেশী শিবাজী টুপি খুলিয়া নিজ মাথা মাতার কোলে রাখিলেন। এতদিনে হারাধনকে মাতা চিনিতে পারিলেন। অমনি চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইল। মহা-হর্ষে সমগ্র মহারাষ্ট্র জানিল—দেশের রাজা নিরাপদে দেশে ফিরিয়াছেন।

শিবাজী দেশে ফিরিলেন, কিন্তু সঙ্গে পুত্রটি নাই। তিনি রটাইয়া দিলেন যে, পথে শম্ভুজীর মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের পথের যত মুঘল-প্রহরীদের মন নিশ্চিন্ত হইলে তিনি গোপনে মথুরার সেই তিন ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিলেন। তাহারা পরিবারবর্গ লইয়া শম্ভুজীকে ব্রাহ্মণের বেশ পরাইয়া, কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিয়া, মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে এক মুঘল কর্মচারী তাহাদের গেরেফ্‌তার করে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহার সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ শম্ভুজীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিল, যেন শম্ভুজী শূদ্র নহেন, তাহাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণাজী কাশীজী ও বিশাজী···এই তিন ভাইকে শিবাজী "বিশ্বাস রাও" উপাধি, এক লক্ষ মোহর এবং বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার জায়গীর পুরস্কার দিলেন।

শিবাজীর পলায়নে আওরংজীবের মনে আমরণ আপসোস হইয়াছিল। তিনি ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় নিজ উইলে লিখিয়াছিলেন, "শাসনের প্রধান স্তম্ভ—রাজ্যে যাহা ঘটে তাহার খবর রাখা; একমুহূর্তের অবহেলা দীর্ঘকাল লজ্জার কারণ হয়। এই দেখ, হতভাগা শিবাজী আমাদের কর্মচারীদের অসাবধানতায় পলাইয়া গেল, আর তাহার জন্য আমাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সব কষ্টকর যুদ্ধে লাগিয়া থাকিতে হইল।"



প্রিয় বালক-বালিকাগণ, আজ তোমাদিগকে যে বীরপুরুষের গল্প বলিতে যাইতেছি, তিনি এই বাঙ্গালাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া যে অপবাদ প্রচলিত আছে তাহা একেবারে অমূলক এবং ভ্রান্ত। যে-দেশে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম ও জালালউদ্দিনের ন্যায় বীর জন্মগ্রহণ করেন সে-দেশ কখনই ভীরু হইতে পারে না। যুগে যুগে বাঙ্গালার বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যে-কোন সময়ের যে-কোন দেশবাসীর গৌরব। আশা করি, তোমরা তাঁহাদের ন্যায় বীরত্বের ও গৌরবের কাজ করিয়া বঙ্গমাতার মর্যাদা রক্ষা করিবে।

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন ; এবং সায়েস্তা খাঁ তখন বাঙ্গালাদেশের সুবাদার (বা গভর্ণর)। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ একজন সামান্য তহশীলদার ছিলেন। তাঁহার মাতা দয়াময়ী বীরাঙ্গনা ছিলেন। কথিত আছে, দয়াময়ী একাকী তরবারি-হস্তে একদল দস্যুকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সীতারাম ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতারামের বাল্যকালের বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও তখন বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ আদর ছিল না, তথাপি তিনি উহা ভালরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং উর্দু ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কেবল ভাষা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি অস্ত্রশিক্ষাও করিয়াছিলেন। গদাচালনে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না এবং তিনি বিখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁ গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি একজন বিদ্রোহী পাঠানকে দমন করিবার জন্য বীর সীতারামকে পাঠাইলেন। সীতারামের অসাধারণ বীরত্বে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত হওয়ায় নবাব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যশোহর জেলার অন্তর্গত নল্‌দী পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ পরগণা পাঠান ও মগের অত্যাচারে জনশূন্য হইয়াছিল। সীতারামের দুইজন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন—মুনিরাম রায় এবং রামরূপ ঘোষ। তিনি উহাদিগের সাহায্যে দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া দেশে পুনরায় শান্তিস্থাপন করিলেন।

সীতারাম এইবার বাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। সীতারামের খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং চারিদিক হইতে লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন এবং বহু দেবমন্দির করাইয়াছিলেন। মাতাপিতা স্বর্গারোহণের পর তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। সেই সময়ে আগ্রায় সম্রাটসকাশে কিছু উপহার লইয়া গিয়াছেন। সম্রাট তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

সীতারাম যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে নিজের রাজধানী স্থাপিত করিলেন। স্থানটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তিনি উহার দক্ষিণদিকে একটি পরিখা খনন ও মধ্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করাইলেন। ধর্মে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল, সেইজন্য স্বীয় রাজধানীতে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রামসাগর দীঘি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ইহার পরে সীতারাম রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে শত্রুজিৎপুর, মহম্মদশাহী পরগণা, মাগুরা, নশীবসাহী পরগণা ও পাবনার কিয়দংশ জয় করিয়া অধিকার করিলেন। এইরূপে পার্শ্ববর্তী ভূম্যধিকারিগণের ভূমি অধিকার করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্য বর্ধিত করিলেন। সীতারামকে বিদ্রোহী জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর দিক হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার আয় ছিল প্রভূত ; কিন্তু তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

রাজা সীতারাম এইবার প্রজাপালনে মনোযোগ দিলেন। তিনি একজন আদর্শ হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি সমুদয় রাজস্ব রাজ্যের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহার রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইল। তাঁহার রাজধানী শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইল। তিনি হিন্দুদিগের জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও মুসলমান প্রজাদিগের জন্য মক্তব স্থাপিত করিলেন। তিনি স্থানে স্থানে মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করাইলেন।

এক্ষণে রাজা সীতারাম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কেমন করিয়া তিনি মুসলমান সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইবেন। সেই সময় মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। রাজা সীতারাম রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে মুর্শিদকুলি সংগ্রাম সিংহ এবং দয়ারাম রায়কে বিদ্রোহী রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। রাজা সীতারাম জানিতেন যে, তাঁহার ন্যায় একজন ক্ষুদ্র রাজার পক্ষে প্রভূত পরাক্রমশালী বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাতুলতা মাত্র। তিনি অনায়াসে সন্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বীরের ন্যায় স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একে একে তাঁহার বীর অনুচরগণ যুদ্ধে নিহত হইলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। ইহাই প্রকৃত বীরের পরিচায়ক। রাজপুত-কুলতিলক রাণা প্রতাপ যেরূপ স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ বঙ্গবীর রাজা সীতারাম স্বীয় স্বাধীনতার জন্য মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের নিকট পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। অবশেষে সীতারাম আহত এবং বন্দী হইলেন। স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সীতারামের বীরত্বের কাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

সার টমাস্ রো

খগেন্দ্রনাথ মিত্র



আমেরিকা পর্যটন করিয়া সার টমাস রো বিলাতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বে হকিন্‌স্ নামক এক ইংরেজ রাজদূত এদেশে আসিয়া মোগল বাদশাহের বিরক্তিভাজন হইয়া দেশে ফিরিতে বাধ্য হন। তখন ইংরেজগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কারণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ডের লোক প্রচুর লাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলে সেই লাভের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। তাঁহারা পুনরায় বাদশাহের দরবারের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সার টমাস্ রো-কেই তাঁহারা মনোনীত করিলেন। যাহাতে তিনি ভারতবর্ষের রাজসভায় উপযুক্ত আদর লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ কর্তৃক তিনি রাজদূত রূপে প্রেরিত হইলেন। তিনি যখন পৌঁছিলেন, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন।

রো মোগল রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখিলেন যে, মোগল রাজসভা লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যশালার ন্যায়। সম্রাট বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত; মস্তকোপরি মণিরত্নখচিত চন্দ্রাতপ ঝলমল করিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে বহুমূল্য পরিচ্ছদ শোভিত আমীরওমরাহগণ। তাঁহারা যেন অভিনেতা; এবং নিম্নে উপবিষ্ট প্রজাসমূহ যেন দর্শকমণ্ডলী।

এইরূপ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সার টমাস্ তিনবার অভিবাদন করিলেন। যে সোপানাবলী দিয়া রাজসিংহাসনতলে উপনীত হওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি সোপানে উঠিয়া তিনি পুনরায় অভিবাদন করিলেন। এইরূপে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রবেশ করিলেন। ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন।

সার টমাস্ লিখিয়াছেন যে, সম্রাট প্রতিদিন প্রাতে প্রাসাদের বাতায়নে বসিতেন। নিম্নে বিস্তৃত ভূমিতলে প্রজাবৃন্দ সমবেত হইয়া জাহাঙ্গীরের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইত। অভাব অভিযোগ থাকিলে তাহাও সে সময়ে তাহারা সম্রাটের গোচর করিতে পারিত। সাধারণের পক্ষে এরূপ সুযোগ যে বহুমূল্য, তাহা বলাই বাহুল্য। একদিন বাতায়নে পর্দার আড়ালে সার টমাস্ দুইজন বেগমকে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তেমন সুন্দরী তিনি জীবনে দেখেন নাই। এই কথা সত্য হইলে বোধ হয় যে, অন্তঃপুরচারিণী বেগমরাও রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। বাতায়নে দর্শন-দানের পর সম্রাট সৈন্যসমাবেশ দেখিতেন এবং তারপর অন্দরমহলে গিয়া আহারাদি সমাপনান্তে নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রাভঙ্গের পর জাহাঙ্গীর জানালায় বসিয়া সিংহ-ব্যাঘ্রের ক্রীড়া দেখিতেন, অপরাহ্নে রাজকার্য দেখিতেন।

একবার সার টমাস্ কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে লিখিয়া সম্রাটের জন্য কিছু নূতন উপঢৌকন আনয়ন করিলেন। ইহার মধ্যে একটি চিত্র দেখিয়া জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন যে, চিত্রে তাঁহাকেই বিদ্রূপ করা হইয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও রো সেই ধারণা অপনোদন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল ; পরদিন ওমরাহগণের অনেক দরবারে জাহাঙ্গীরের ক্রোধ-শান্তি হইল।

তখন সার টমাস্ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন। জাহাঙ্গীর সার টমাস্ রো-কেই সেই ফারমানের খসড়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সার টমাস্ কোম্পানীর যাহাতে সর্বপ্রকারে সুবিধা হয়, সেইরূপ এক ফারমানের প্রতিলিপি লিখিয়া আনিলেন। কিন্তু রাজকুমার শাহজাহান ও অন্যান্য পারিষদবর্গ তাহার প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। কাজেই সার টমাসের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বাধা পড়িয়া গেল। তখন শাহজাহানকে কোনওরূপে হাত করিয়া এবং অন্য পারিষদগণকে উপঢৌকন দিয়া সার টমাস্ কৃতকার্য হইতে চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে সন্ধিপত্র অনুমোদিত হইল এবং সম্রাট তাহা শীলমোহর করিয়া দিলেন। চুক্তি হইল এই যে, ইংরেজদিগকে বাঙ্গালায় এবং মোগলরাজ্যের মধ্যে অন্য-স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। মোগল রাজকর্মচারীরা কোম্পানীর প্রতি অযথা উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না,—করিলে তাঁহারা সম্রাট কর্তৃক দণ্ডনীয় হইবেন।

এইরূপভাবে সফলতা লাভ করিয়া সার টমাস্ রো স্বদেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনি সম্রাটের নিকট হইতে প্রথম জেম্‌সের নামে যে পত্রোত্তর লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ :—

“যখন আপনি এই পত্র পাঠ করিবার জন্য প্রথম খুলিবেন, আশা করি তখন ইহার মর্মার্থ অবগত হইয়া আপনার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইবে। আপনার গৌরব ও শক্তি শতগুণে বর্ধিত হউক, শত শত বিদেশীয় নরপতি আপনার পদানত হউক, আপনার দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার হউক এবং আপনার নিকটবর্তী দেশসমূহের নৃপতিবৃন্দ সম্পদে বিপদে আপনার সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হউন। টমাস্ রো-কে যে আপনি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। ইঁহার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছি। আপনার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন উপহার-সামগ্রগুলি অতি সুন্দর। আমি সেগুলি সর্বদাই দেখিতে কামনা করি।”



বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অনেকদিন পূর্বে ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। কথাটা খুবই সত্য। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার পূর্ব গৌরবের কথা, এবং বর্তমান বাঙ্গালীর সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াই ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি সেই সমুদয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। যে কয়েকটি দোষ বাঙ্গালী জাতির মজ্জাগত চরিত্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস তাহা যে পুরাকালে বিদ্যমান ছিল না, ইহা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালীরা কোন বড় ব্যাপারে একমত অবলম্বন করিয়া কাজ করিতে পারে না—সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে না, ইহা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে মস্ত একটা অভিযোগ; কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালী-চরিত্রের মজ্জাগত দোষ নহে, প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ। সেই ঘটনার কথাই বলিব।

প্রায় বারোশত বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালার বড়ই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশাল বঙ্গসাম্রাজ্য তখন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। কান্যকুব্জরাজা হর্ষবধনের রাজনীতির ফলে বঙ্গদেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। সুযোগ পাইয়া বিদেশীয় রাজগণ পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্যস্ত করিতেছিলেন। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণ, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, কামরূপরাজ হর্ষ এবং অজ্ঞাতনামা শৈলবংশীয় এক নৃপতি এই সময়ে বঙ্গদেশে বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন। এই সমুদয় আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র দেশের উপর কোন রাজশক্তি ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসন করিতেন, এবং তাঁহাদের পরস্পর কলহ ও অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টের আর অবধি ছিল না।

এই অরাজকতা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে বাঙ্গালী নায়কগণ এক মহৎ সঙ্কল্প করিল। তাহারা সকলেই স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে

সমস্ত দেশের অধিপতি বলিয়া মনোনীত করিল, এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। অচিরে আবার বঙ্গদেশে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল।

জগতের ইতিহাসে এরূপ অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখা যায় না। গত শতাব্দীতে জাপানে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহার ফলে কবিবর হেমচন্দ্রের 'অসভ্য জাপান' আজ পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রবল শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। আজ জাপানের শক্তি সম্মান ও গৌরব এশিয়ার আদর্শ এবং ইউরোপ-আমেরিকার হিংসা ও ভীতির বিষয় হইয়াছে। জাপানের সামুরাই-নায়কগণের আত্মত্যাগ বিফল হয় নাই।

বাঙ্গালীর আত্মত্যাগও ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালীর নির্বাচিত রাজা গোপাল বঙ্গদেশকে একটি প্রবল রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্তে বাঙ্গালার বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। ভারতের প্রাচীন রাজধানী কান্যকুব্জে যেদিন মহাসমারোহে সম্রাট পদবীতে তাঁহার অভিষেক হয় এবং পঞ্চাল বৃদ্ধগণ সুবর্ণ-কলসী হইতে পবিত্র তীর্থজল তাঁহার মস্তকে বর্ষণ করেন, তখন আর্যাবর্তের প্রধান প্রধান রাজগণ অবনত মস্তকে এই বাঙ্গালী বীরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সাধুবাদ উচ্চারণ করেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে বাঙ্গালীজাতি পরপীড়নে ও আত্মকলহে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল, বাঙ্গালীর অপূর্ব একতা স্বার্থত্যাগের ফলে সেই বাঙ্গালীজাতি সমগ্র আর্যাবর্তের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিল। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল হিমালয় হইতে নর্মদা এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছেন। তখন বাঙ্গালী হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাঙ্গালী-সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনায় মাতিয়াছিল।

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিমুখ, কোনরূপ বিপজ্জনক অথবা অনিশ্চিত জীবনযাত্রার পরিবর্তে নিশ্চিন্তে গৃহ-সুখ ভোগ করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। ইহার বিরুদ্ধেও প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) হইতে জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালী সমুদ্র পার হইয়া মলয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইত। তখনকার দিনে ছোট ছোট কাঠের জাহাজে অজ্ঞাত পথে অসীম সমুদ্র পার হওয়ার সাহস যাহাদের ছিল, তাহারা ভীরু, দুর্বল এবং দুঃসাহস-বিমুখ বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। এই সমুদ্রযাত্রায় যে কত আপদ-বিপদ হইত, প্রাচীন গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়া তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালী এই সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছে। ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া যে প্রাচীন বাঙ্গালীর সাহস, দৃঢ়তা ভীতিশূন্যতা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্তির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক সত্য। সিংহল-দেশীয় ইতিহাসে বর্ণিত বাঙ্গালী বিজয় সিংহের অভিযান-কাহিনীও অন্তত এই হিসাবে সত্য।

কিন্তু কেবল রাজ্য-জয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেই বাঙ্গালীর চরিত্রের এই দিক ফুটিয়া উঠে নাই। বাঙ্গালার অনেক ধর্মবীর ধর্মের প্রেরণায় সমুদ্র পার হইয়া দূর বিদেশে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছেন। যে শৈলেন্দ্র-বংশীয় পরাক্রান্ত সম্রাটগণ মলয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দীপপুঞ্জে

রাজত্ব করিতেন—আরব বণিক্‌গণের মত যাঁহাদের সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে দুই বৎসর সময় লাগিত—তাঁহারাও বাঙ্গালী ধর্মবীরকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য মনে করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। শৈলেন্দ্র-বংশের শিলালিপিতে রাজগুরু বাঙ্গালী কুমার ঘোষের এবং তাঁহার নির্দেশমতে যে বিশাল দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে বিশাল হিমালয় পার হইয়া বহু বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারক যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিব্বতীয়েরা আজও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর ইঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন। এখনও তিব্বতের ঘরে ঘরে দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা হয়।

বাঙ্গালী আজ আত্মকলহে, ঐক্যের অভাবে, উদ্যমহীনতায় ও উচ্চ আদর্শের ক্ষুণ্ণতায় অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের মধ্যেও যে মহত্ত্বের বীজ আছে, উপযুক্ত আবহাওয়ায় তাহা আবার অঙ্কুরিত হইতে পারে, এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে আবার আমরা বুকে বল বাঁধিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। 'বাংলার মাটি ও বাংলার জল' যে কেবল কাব্য ও কোমল-কান্ত পদাবলীর উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে, উচ্চ মনুষ্যত্বের উপাদানও ইহার মধ্যে নিহিত আছে, আজ তাহা স্মরণ করিয়া যেন আমরা জীবনযাত্রার কঠোর সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি।



হাত উঠায়া যব

বিশ্বপতি চৌধুরী

॥ ১ ॥

ভারতের অদ্বিতীয় গায়ক তানসেনের নাম তোমরা সকলেই বোধ হয় শুনেছ। আজও আমাদের দেশের বড় বড় গায়কেরা মিঞা তানসেনের নামে কপালে হাত ঠেকিয়ে বার বার সেলাম ঠুকে থাকেন। জবরদস্ত্ কালোয়াতের দল আজও আসরে গান শুরু করবার পূর্বে বীণাপাণির এই বরপুত্রটিকে স্মরণ ক'রে ডান হাত দিয়ে নাসিকা ও কর্ণমূল তিনবার স্পর্শ ক'রে থাকেন। এতবড় জবরদস্ত্ গায়ক ছিলেন এই মিঞা তানসেন।

প্রবাদ আছে, ইনি এতবড় গুণী ছিলেন যে, মেঘরাগ ভেঁজে খর-গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ নীলাকাশকে নিমেষে মেঘাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারতেন। আবার দিল্লীর দারুণ শীতে মানুষ যখন হি-হি ক'রে কাঁপছে, সেই সময় তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত দীপক রাগ দেখতে দেখতে দারুণ রৌদ্রতাপে সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো।

এইসব আজগুবী গল্প তোমাদের বিশ্বাস করতে বলি না ; কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারছ, এদেশের লোকেরা তানসেনকে কী চক্ষে দেখত।

এহেন তানসেনেরও একজন ওস্তাদ ছিলেন। বাবারও বাবা আছেন ; সুতরাং ওস্তাদ তানসেনেরও ওস্তাদ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। এই ওস্তাদজীটির নাম হরিদাস স্বামী।

সাকরেদের গুণপনার কথা তো শুনলে, এখন ওস্তাদজীর গুণপনার কথাটা একবার কল্পনায় ভেবে দেখ!

হরিদাস ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। বৃন্দাবনের এক নির্জন বনে, লোকালয় থেকে বহুদূরে একটি কুটীর রচনা ক'রে সেইখানেই তিনি বাস করতেন, আর সকাল-সন্ধ্যায় তানপুরাটি তুলে নিয়ে আপন মনে ভগবানের গুণকীর্তন করতেন। সে গান পৃথিবীর নয়। সে গান সুদূর কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ ২ ॥

সম্রাট আকবর শিকারে বেরিয়েছেন। বৃন্দাবনের একটি নিবিড় জঙ্গলে সম্রাটের ছাউনি পড়েছে। সেদিন অনেক তোড়জোড় করা হয়েছিল ; কিন্তু কিছুতেই শিকার মিললো না। সারাদিন বনবাদাড় ভেঙে বৈকালের দিকে অবসন্ন দেহ আর তারও চেয়ে অবসন্ন মন নিয়ে নিতান্তই নিরাশ হয়ে বাদশা যখন শিবিরে ফেরবার

ব্যবস্থা করছেন, সেই সময় সহসা একটা প্রকাণ্ড বন্য হরিণ তাঁর নজরে প'ড়ে গেল। আর যায় কোথা! আকবর শিকারের পশ্চাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। হরিণও ছোটে যত, ঘোড়াও ছোটে তত। বাদশা ছুটেছেন তো ছুটেইছেন। কিন্তু হরিণকে কিছুতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছে না। কাছাকাছি না পেলে বর্শা ছুঁড়বেনই বা কেমন ক'রে ?

তাঁর অশ্ব ক্রমেই হাঁপিয়ে পড়ছে; ফলে শিকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্বের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলেছে। এদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে পড়বার মত হয়েছে। কিন্তু শিকারের ঝোঁক বড় ঝোঁক।

বাদশা একবার পশ্চাতের পানে তাকালেন।—তাঁর সঙ্গীদের কোন চিহ্ন নেই। তারা অনেকখানি পেছিয়ে পড়েছে। হয়ত বা তারা তাঁকে অনুসরণ করতে না পেরে ভুল ক'রে ভিন্ন পথে চলে গেছে। গেছে যাক্—তাতে ক্ষতি নেই—একাই তিনি শিকারের পশ্চাতে ছুটবেন। কিন্তু এই ভাবে ছুটলে হরিণ আর একটু পরেই দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে পড়বে। তখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এমনি ধারা যখন অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ আকবর দেখেন, দূরে—বহুদূরে তাঁর শিকারটি সহসা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট অবাক হয়ে গেলেন;—এ কি ব্যাপার ?—হরিণটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেন ? মুহূর্ত পূর্বেও সে যে-রকম দ্রুত ছুটছিল—তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে এতটুকুও হাঁপিয়ে পড়ে নি। অবাক হয়ে সম্রাট শিকারের পানে অশ্ব ছোটালেন। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে; কিন্তু হরিণ তো নড়বার নামটি পর্যন্ত করে না। সম্রাট আরও নিকটে গেলেন—তবুও সেই একই ভাব।

আর একটু অগ্রসর হতেই হঠাৎ দূর থেকে অস্পষ্ট একটি সঙ্গীতের রেশ তাঁর কানে ভেসে এলো, কি অপূর্ব সে সঙ্গীত!—সে যেন মানুষের সমস্ত চেতনাকে অভিভূত ক'রে ফেলে; সে যেন মানুষের মনকে কোন্ এক স্বপ্নলোকে উধাও ক'রে নিয়ে যায়।

ঘোড়াটি কখন এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—বাদশা তা জানতেও পারেন নি। হরিণের কথাও তিনি ভুলে গেছেন। সমস্ত চেতনা যেন দূরাগত সেই সঙ্গীতের মোহঘোরে আচ্ছন্ন।

সহসা গান থেমে গেল। বাদশা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠলেন।—চেয়ে দেখেন, হরিণটিও হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে প্রাণভয়ে আবার ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

আকবর কিন্তু আর তাকে অনুসরণ করলেন না—সে প্রবৃত্তিও এখন তাঁর নেই। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন—হরিণটি হঠাৎ অমন ক'রে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন।

কিন্তু কে সেই অপরিচিত গায়ক, যার গান মৃত্যুভয়ে ভীত বনের পশুকেও এমন ক'রে মুগ্ধ করতে পারে ? আকবর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তারপর যেদিক থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল সেই দিক লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

সরু আঁকাবাঁকা বন্যপথ। দু ধারে নিবিড় ঘন জঙ্গল। বাদশা উন্মুখ হয়ে চলেছেন। গাছপালার আড়ালে ঐ না কার কুটীরের চালা দেখা যায় ?—হ্যাঁ, কুটীরই তো বটে!

॥ ৩ ॥

ছোট্ট একরত্তি ঘর।—যেমন জীর্ণ, তেমনি অপরিসর। তারি মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে একটা হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন একটি দীর্ঘকায় পুরুষ। ঘরখানি এত ছোট যে, তাঁর পা দুটির কতক অংশ দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

কুটীরের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই একজোড়া পা বাদশার চোখের সুমুখে জেগে উঠলো। এ দৃশ্য দেখতে সম্রাটের চোখ কোনদিনই অভ্যস্ত নয়। আকবর শার চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

এই সময় কুটীরের ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো—"কে ওখানে ?"

উত্তর হোলো—"আমি দিল্লীর সম্রাট আকবর শা, তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি।"

আকবর মনে ভেবেছিলেন, একথা শোনবামাত্র কুটীরবাসী লোকটি নিশ্চয় তাঁর পা দুটি শশব্যস্তে গুটিয়ে নেবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আকবর শার বাদশাহী মেজাজ এইবার উদারা, মুদারা থেকে একেবারে তারায় ঠেলে উঠলো। জলদ গম্ভীর স্বরে তিনি বলে উঠলেন—"পা উঠায়া কব্ ?"

সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর এলো—"হাত উঠায়া যব্ !"

আকবর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতবড় উত্তর আজ পর্যন্ত তিনি কারুর মুখ থেকে শোনেন নি। সত্যই তো, সংসারের সমস্ত বাসনা-কামনা থেকে যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে নিয়েছে, জগতের সবার সামনে পা তোলবার অধিকার তো একমাত্র তারই। তার কাছে সম্রাট আর পথের ভিখারীতে প্রভেদ কোথায় ?

গুণগ্রাহী সম্রাট কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর সহসা একসময় সেই অপরিচিত মহাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করলেন।

ইনিই হচ্ছেন তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী। এরপর বাদশার আগ্রহাতিশয্যে হরিদাস স্বামী তাঁর প্রিয় শিষ্যটিকে আকবর শার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর এই হিন্দু শিষ্যটি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে বাদশার কাছ থেকে তানসেন উপাধি লাভ করেছিলেন।



চিতোরের মহারাণা লাক্ষসিংহ পাত্রমিত্র লইয়া সভায় বসিয়া আছেন—এমন সময় মারবারের রাজা রণমল্লের দূত নারিকেল হাতে উপস্থিত হইল। নারকেল আনার অর্থ বিবাহের প্রস্তাব।

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দূত, নারিকেল কার জন্য ?"

দূত—"যুবরাজ চণ্ডের জন্য।"

রাণা—"বেশ, বেশ ! মারবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ, বড়ই আনন্দের কথা। দূত, তুমি অপেক্ষা কর। যুবরাজ এক্ষনি আসবে ; সে নিজ হাতে নারিকেল গ্রহণ করে, সেটাই ভাল। সে নিতান্ত ছেলে-মানুষটি নেই, তার মতামত ছাড়া তো গ্রহণ করা চলে না।"

রাণা বড় রসিক লোক ছিলেন। তিনি নানা প্রকার রহস্যালাপ করিতে লাগিলেন,—রহস্যচ্ছলে বলিয়া ফেলিলেন—"আমারও একদিন ছিল হে—ছিল, যখন আমার জন্যও নারিকেল আসত। এখন বুড়ো হয়েছি—দাঁত পড়ে গেছে—নারিকেল আর চিবোতে পারব না বলে কেউ আর নারিকেল পাঠায় না।" ঠিক এই সময়ে যুবরাজ চণ্ড সভায় প্রবেশ করিয়া পিতার রহস্যালাপ শুনিলেন। রাণা বলিলেন—"এই যে চণ্ড, মারবারের রাজা নারিকেল পাঠিয়েছেন—গ্রহণ কর।"

যুবরাজ নিরুত্তর রহিলেন, নারিকেল গ্রহণ করিলেন না। রাণা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, —"চণ্ড, তোমার কি মারবারের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে ? মারবারের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া তো গৌরবের কথা, বাবা। তা ছাড়া মারবার রাজ্যের অপমান করা তো চলে না।"

যুবরাজ—"এ নারিকেল আমি গ্রহণ করতে পারি না, বাবা। আপনি একটু আগেই যে কথা বললেন, তাতে আপনার মনে ক্ষণকালের জন্যও একটু ভাবান্তর ঘটেছিল। তার ফলেই মারবার-রাজকন্যাকে আর আমার বিয়ে করা চলে না—ক্ষণকালের জন্যও ঐ কন্যা আমার মাতৃস্থানীয়া হয়েছেন।"

রাণা—"চণ্ড, তুমি অবাক্ করলে যে! আমি তো এমন কিছুই বলি নি বা ভাবি নি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে এ বয়সে আমার বিয়ের লোভ আছে। তুমি কি একটা রসিকতাও বোঝ না—রসিকতার কথা থেকে কি কোন কিছু অনুমান ক'রে নিতে হয়? পাগলামি করো না—নারিকেল গ্রহণ কর, অন্য আপত্তি কিছু থাকলে বল।"

যুবরাজ—"অন্য আপত্তি আমার কিছুই নেই।"

রাণা—"তবে সামান্য একটা রসিকতার জন্য তুমি মারবার-রাজাকে অপমানিত করবে? এ তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

যুবরাজ—"অপমান কেন করা হবে, বাবা? আপনি এই নারিকেল নিজে গ্রহণ করুন।"

রাণা রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—"চণ্ড, এমন অবুঝ হয়ো না। আমি এই জীর্ণ বয়সে বিয়ে করবো, তুমি ছেলে হয়ে এমন কথা বললে!"

যুবরাজ—"উপায় কি? আপনার বিয়ের বয়স গিয়েছে একথা আমি মনে করি না।"

রাণা—"চণ্ড, তুমি জান, রণমল্লের কন্যাদানের কি উদ্দেশ্য? তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর দৌহিত্র ভবিষ্যতে মিবারের রাণা হয় এবং দুটি রাজ্য সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে চিরদিন আত্মরক্ষা করে। তা কি ক'রে সম্ভব হয়?"

যুবরাজ—"খুব সম্ভব হয়। যদি এই রাজকন্যার গর্ভে পুত্রসন্তান হয় তবে সে-ই মিবারের রাণা হবে। আমি রাজ্যের দাবি করব না। একলিঙ্গজীর নামে, বাপ্পারাও-এর নামে, চিতোরের চতুর্ভুজা দেবীর নামে শপথ করছি—আমি তাহলে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করব, রাজার ভৃত্য হয়ে রাজ্য পালন করব।"

রাণা পুত্রের দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"দূত, নারিকেল আমি নিজেই গ্রহণ করলাম। মারবার-রাজকে বলো তাঁর যদি বুড়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি থাকে, তবে অন্যত্র দিতে পারেন, তাতে আমি অপমান বোধ করব না। ব্যাপারটা তো স্বচক্ষেও দেখলে—স্বকর্ণে সব কথা শুনলে—রাজাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। আমি কেবল রাজার সম্মান রক্ষার জন্য নারিকেল গ্রহণ করলাম।"

দূত মারবারে গিয়া যথাযথ ব্যাপার জানাইল। দৌহিত্র মিবারের রাণা হইবে, মারবার-রাজ এই লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাণা লাক্ষের সঙ্গেই কন্যা যোধার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।

শীঘ্রই বিবাহ হইয়া গেল। অল্পদিন পরেই যোধার একটি পুত্রও হল। পুত্রের নাম মুকুলজি। চণ্ড রটাইয়া দিলেন—মুকুলজিই যুবরাজ—ভাবী রাণা,—তিনি রাজ্যের সেনাপতি। কিছুদিন পরে রাণা লাক্ষের মৃত্যু হইল। চণ্ড মুকুলজিকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেশময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—চণ্ড দ্বিতীয় ভীষ্ম বলিয়া দেশের সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহারাণী যোধার মনে হিংসার ভাব জাগিয়া উঠিল। নানা জনে নানা প্রকারের কুপরামর্শ দিতে লাগিল—যোধার পিতৃকুল হইতেও বিষের বাতাস বহিয়া আসিতে লাগিল।

যোধা ভাবিলেন—রাজপুত সর্দারগণ ও প্রজাসাধারণ চণ্ডকে দেবতার মত ভক্তি করে—সমস্ত রাজসম্মান চণ্ডই অধিকার করিয়া লইতেছে। প্রজারা নিশ্চয়ই চায় চণ্ড রাজা হউক। চণ্ড দেশের লোককে

এইভাবে বশীভূত করার জন্য হয়ত চাতুরী-জাল বিস্তার করিতেছে। ভিতরে ভিতরে মুকুলের প্রাণবধের জন্য হয়ত চক্রান্ত চলিতেছে। চণ্ড যতদিন রাজ্যে থাকিবে ততদিন মুকুলের জীবন ও সিংহাসন কোনটাই নিরাপদ নয়।

নানাপ্রকার সন্দেহে যোধার মন চণ্ডের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল।—যোধা নানাভাবে চণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন এবং এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন চণ্ড রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি খুশীই হন। চণ্ড বিমাতার মতলব বুঝিতে পারিয়া জনকয়েক বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে লইয়া মান্দুরাজ্যে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় যোধাকে বলিয়া গেলেন—

"মা, আপনি পছন্দ করেন না আমি রাজ্য রক্ষা করি। চললাম,—মুকুলের যেন কোন বিপদ না হয়। যদি কোন বিপদ ঘটে সংবাদ পাঠাবেন, আমি যেমন ক'রে পারি তাকে রক্ষা করব।" যোধা কোন উত্তর দিলেন না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

চণ্ডও চলিয়া গেলেন—রণমল্ল পুত্র ও লোকজন লইয়া মিবারে আসিলেন দৌহিত্রের রাজ্য রক্ষা করিতে। মিবার মারবারী লোকে ভরিয়া উঠিল—যোধা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রণমল্লের উদ্দেশ্য নয় রাজ্যরক্ষা—তাঁহার উদ্দেশ্য এই সুযোগে রাজ্যগ্রাস। মুকুলকে কোলে করিয়া তিনি নিজেই সিংহাসনে বসিতে লাগিলেন। একে একে মিবার রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা মারবারীদের হাতে আসিল। এমন কি মুকুলের দাসদাসীগুলিও মারবার হইতে আমদানী হইল।

রণমল্লের প্রধান ভয় চণ্ডকে। আর-একস্থান হইতেও ভয় ছিল আরো বেশী। চণ্ডের ছোট ভাই রঘুবীর মিবার ত্যাগ করিয়া কৈলবারায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন—তাঁহার অনুগত বাধ্য লোক ছিল অনেক বেশি—মিবারের লোক তাঁহাকে দেবতার মত মনে করিত। তিনি যদি একবার শোনেন—মিবারের রাজকুলের কোন অমঙ্গল ঘটিতেছে—তাহা হইলে রক্ষা নাই। রণমল্ল গুপ্তহন্তার সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এ ঘটনার কথা গোপন থাকিল না—মিবারে যখন এ সংবাদ পৌঁছল তখন মিবারের লোকের মনে ঘোরতর সন্দেহের উদ্রেক হইল—রাণীরও তখন চৈতন্য হইল। রাণী বুঝিতে পারিলেন মুকুলের জীবন আর নিরাপদ নয়, পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না।

তখন রাণীর মনে পড়িল চণ্ডের কথা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী চণ্ডের কাছে দূত পাঠাইলেন। চণ্ড সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কতকগুলি লোকজন লইয়া চিতোরের নিকটে পৌঁছিলেন—রাণী মুকুলজিকে কয়েকটি বিশ্বস্ত সর্দারের সঙ্গে কৌশলে চিতোরের বাহিরে পাঠাইলেন। দুই দল মিলিত হইলে চণ্ড চিতোর আক্রমণ করিলেন। মারবারীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু চিতোরের বুকের উপরে মারবারীরা কতক্ষণ যুঝিবে? সহজেই নির্মূল হইয়া গেল। যুবরাজ যোধ পলাইল। রণমল্লের পলাইবার উপায় ছিল না—রণমল্ল নেশা করিয়া ঘুমে অচেতন ছিলেন। একজন মিবারী দাসী পালঙ্কের পায়ার সঙ্গে তাঁহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। রণমল্লের গৃহে যখন চণ্ডের লোকজন প্রবেশ করিল—রণমল্ল তখন পালঙ্কসুদ্ধ পিঠের উপরে তুলিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সত্বর মিবারীদের হাতে প্রাণ হারাইলেন।

চণ্ড মারবারের রাজধানী অধিকার করিলেন—যোধ পালাইয়া গিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন—তাহারই নাম যোধপুর। মিবারের সঙ্গে মারবারের সন্ধি হইল। মুকুলজিকে সিংহাসনে বসাইয়া চণ্ড সমস্ত জীবন ধরিয়া চিতোরের রাজগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।



নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতায় তোমরা নিশ্চয়ই শিখ দেখিয়াছ। মাথায় বড় বড় চুল—হাতে লোহার বালা, এমন যে সব লম্বা-চওড়া লোক—মোটর গাড়ি বা বাস চালায়, ইহারা শিখ। ইহারা খুব খাটিতে পারে আর ইহাদের গায়ে জোরও খুব। পঞ্জাবেই অধিকাংশ শিখের বাড়ি। তবে ইহারা পয়সা উপায়ের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। ভারতের বাহিরে বর্মা, সিঙ্গাপুর, চীনদেশ, আমেরিকা প্রভৃতি বহুস্থানে শিখেরা কাজ-কারবার করে ও অনেক টাকা রোজগার করে।

'শিখ' শব্দে ভক্ত বা শিষ্য বুঝায়। ইহারা হিন্দু হইলেও শুধু নিজেদের গুরুদের মানে। পরপর দশজন গুরু শিখদের নেতা হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বাবা নানক প্রথম আর গুরুগোবিন্দ সিং শেষ। নানকই শিখ-ধর্ম প্রচার করেন। প্রায় পৌনে তিনশত বৎসর আগে (১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে এক ছত্রির ঘরে (ক্ষত্রিয়বংশে) বাবা নানকের জন্ম হয়। ছেলেবেলা হইতেই নানকের মন সংসারে বসিত না। তিনি ভজন-সাধন করিতেন। তাঁহার বাপ ছেলেকে ব্যবসায় লাগাইয়া দিলেন, তিনি কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ করা দূরে থাকুক, সন্ন্যাসী-ফকিরকে দান করিয়া দোকানের সব পুঁজি (মূলধন) উড়াইয়া দেন। নানক বাড়ির লোকের অনুরোধে বিবাহও করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন নবাব সরকারে চাকুরিও করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী মারা যাইবার পর একেবারে সংসার ছাড়িয়া দেন। নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান এবং ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে সংসারের মায়া-মোহ সবই তাঁহার চলিয়া যায়। এক ঈশ্বর, সর্ব-শক্তিমান ভগবানের উপাসনায় মানুষ শান্তি লাভ করে, এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বুঝিলেন, খুব জাঁকজমক করিয়া পূজা-পাঠে প্রকৃত ধর্ম হয় না, আর লোককে ঘৃণা করিলে পাপ হয়—বা ধর্মের নামে আরও অধোগতি হয়। ঈশ্বরে ভক্তিই যে সব উপাসনার সার ইহাই তাঁহার শিক্ষা হইল। নানক হিন্দু মুসলমানের ভেদ করিতেন না—দুইজন করিয়া ক্রমে নানা জাতির ও নানা ধর্মের লোক তাঁহার ভক্ত হইল, এবং হিন্দুরা তাঁহাকে গুরু বলিতে লাগিল। মুসলমানেরা তাঁহাকে পীর বলিত। বাবা নানক বহু দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি কাবুল, পারস্য, এমন কি মক্কায়ও গিয়াছিলেন। কথিত আছে, মক্কায় গিয়া তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া শুইয়াছিলেন। উহা দেখিয়া এক মোল্লা তাঁহাকে গালাগালি দেন। নানক

তখন তাঁহাকে বলেন—"মোল্লা সাহেব, আমি মূর্খ, যেদিকে ঈশ্বর নাই সেইদিকে আমার পা আপনি ফিরাইয়া দিন।" মোল্লা তাঁহার কথার মানে যখন বুঝিলেন তখন খুব লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। নিজের উপদেশগুলি লইয়া নানক গান বাঁধিতেন আর তাঁহার শিষ্য মর্দানা ঐগুলি গাহিত। এই মর্দানা আগে মুসলমান ছিল, পরে নানকের পবম ভক্ত হয়।

৭১ বৎসর বয়সে (১৫৩৯ খ্রীঃ) বাবা নানক দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার হিন্দু শিষ্যেরা তাঁহার দেহ পোড়াইতে চায় ও মুসলমানেরা কবর দিতে উদ্যত হয় শুনা যায়, এই বিবাদের সময় একজন শিষ্য শবের উপরের কাপড়টি উঠাইয়া দেখে যে গুরুর দেহ নাই, কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে! হিন্দু শিষ্যেরা উহার অর্ধেক লইয়া পোড়াইয়া ফেলে, মুসলমানেরা বাকী অংশ কবর দেয়।

নানকের পর তাঁহার এক ক্ষত্রিয় শিষ্য গুরুর গদীতে বসেন। উহার পর ক্রমে নয়জন গুরু শিখদের নেতা হন। গুরু রামদাসের সময় অমৃতসরের বিশাল পুষ্করিণী ও মন্দির তৈয়ারী হয়। ক্রমে শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে ও গুরুদের ধন-সমৃদ্ধিও অনেক হয়। পঞ্জাবের বহু জাতির লোক এই গুরুদের ভক্ত হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে গুরুরা ও ক্রমে শিখেরা মোগল বাদশাহের কর্মচারীদের সন্দেহের পাত্র হইয়া পড়েন। পঞ্চম গুরু অর্জুনের কারাগারে মৃত্যু হয়, এবং ইহার পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় নবম গুরু তেগ্ বাহাদুরের বিদ্রোহী বলিয়া প্রাণদণ্ড হয়।

এইসব অত্যাচারের ফলে শিখেরা ক্রমে চাষবাস ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে শেখে। তেগ্ বাহাদুরের পুত্র গোবিন্দ সিং উহাদের যুদ্ধ করিতে শিখান এবং যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করেন। মোগলদের সহিত গুরুগোবিন্দের বহুদিন যুদ্ধ চলে। মোগলসৈন্য অনেকবার হারিয়া গেলেও শেষে গুরুকে স্থানত্যাগ করিতে হয়। এই যুদ্ধবিগ্রহের সময় পঞ্জাবের জাঠরা দলে দলে শিখ-ধর্ম গ্রহণ করে এবং লড়াই-এর সময় অসুবিধা হয় বলিয়া গোবিন্দ সিং খাওয়া-দাওয়া আচার-ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন করেন। এমন কি জাতিভেদ তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন বলিলেও চলে। প্রত্যেক শিখকে তিনি অস্ত্রধারণ করিতে, মাথায় বড় চুল রাখিয়া উহাতে একটি চিরুনি রাখিতে শিখান; আর তাহাদের ছোট ইজের পরিতে ও হাতে বালা রাখিতে উপদেশ দেন। প্রত্যেক শিখই এখন এইগুলি ধারণ করে। ইহা তোমরা শিখদের দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

গোবিন্দ সিংএর পর আর কেহ গুরুর গদীতে বসে নাই। গুরুর স্থানে 'খালসা' বা শিখজাতির ধর্মমণ্ডল স্থাপিত হয় এবং শিখেরা "ওয়া গুরুজী কি ফতে—ওয়া গুরুজী কি খালসা" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া শত্রু দমনে নিযুক্ত হয়।

মোগলেরা এই সময় শিখেদের উপর অনেক অত্যাচার করে এবং গোবিন্দ সিংএর দুই পুত্রকে জীবন্ত কবর দেয়। গোবিন্দের এক শিষ্য বান্দা বৈরাগী ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্যোগী হয় এবং তাহার অধীনে দলে দলে শিখ পঞ্জাবে মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। কিন্তু শেষে বাদশাহী ফৌজের কাছে বান্দার দলবল হারিয়া যায় ও উহাদের একেবারে নির্মূল করা হয়। সেই সময় মোগলেরা শিখদের উপর যে অত্যাচার করে সে কথা শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়। বড় চুলওয়ালা মাথা দেখিলেই মোগলেরা কাটিয়া ফেলিত। কোন শিখের মাথা আনিতে পারিলে লোকে পুরস্কার পাইত। আর শিখেদের পবিত্র স্থানগুলিও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

যাহা হউক অত্যাচারের ফলে শিখেরা যোদ্ধার জাতি হইয়া উঠে। ভীরু জাঠ চাষার দল ক্রমে এমন যোদ্ধা হইয়া উঠে যে, মোগলেরা উহাদের ভয়ে পালায়। আর যত দিন যাইতে লাগিল, মোগলেরা ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল। উহারা যতই দুর্বল হইল, শিখদের বল ক্রমে ততই বাড়িতে লাগিল। এই শিখেরা ক্রমে ছোট বড় অনেকগুলি দল গড়িয়া তুলিল। প্রত্যেক দলের দলপতির অধীনে অনেক ঘোড়সওয়ার থাকিত—তীর ধনুক বর্শা বন্দুক লইয়া ইহারা লড়িত। সুবিধা পাইলেই ইহারা মোগলদের ছোট ছোট দল নষ্ট করিত—আর টাকাকড়ি লুটিয়া লইত। এই সময় পাঠানেরা পঞ্জাবে কিছুদিন রাজত্ব করে। উহারাও শিখদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে ও শিখদের ধর্মমন্দির এবং পূজার স্থান অপবিত্র করে। কিন্তু শেষে উহারাও হারিয়া যায় এবং পঞ্জাবে শিখ সর্দারেরা রাজত্ব করে। এই সর্দারদের দলগুলিকে "মিশল" বলিত। এই মিশলদের দলপতিরা ক্রমে সমস্ত পঞ্জাব দখল করিয়া লয়।

এই সর্দারদের মধ্যে আবার যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। ক্রমে "মুকর-যকির" মিশলের দলপতি সর্বাপেক্ষা প্রবল হন। এই সর্দারের বংশে রণজিৎ সিংএর জন্ম হয়। রণজিৎ সিং দেখিতে খর্বাকৃতি ছিলেন, লেখাপড়া জানিতেন না, আর তাঁহার একটি চোখ কানা ছিল। কিন্তু তাঁহার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এবং যুদ্ধেও তিনি খুব পটু ছিলেন। তিনি সমস্ত পঞ্জাবের মিশলগুলি জয় করেন এবং কাশ্মীর, মুলতান, পেশোয়ার প্রভৃতি জয় করিয়া এক বিশাল রাজ্য স্থাপনা করেন। তিনি ফরাসী ও অন্য জাতির সাহেব সেনাপতি রাখিয়া শিখদের বিলাতী কায়দায় শিক্ষিত যোদ্ধায় পরিণত করেন। তাঁহার ভয়ে সমস্ত শত্রু মাথা নোয়াইত। পাঠানেরা অনেকবার তাঁহার নিকট হারিয়া যায়। রণজিৎ সিং পঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। ইংরেজরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রণজিৎ সিংএর মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার বংশে অনেক মারামারি কাটাকাটি হয় এবং শিখরাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। শেষে একটি পাঁচ বৎসরের বালক দলীপ সিং লাহোরের রাজা হন। এই শিশুকে গদীতে পাইয়া আরও নূতন নূতন দলাদলি ও চক্রান্ত চলে এবং শিখ সৈন্যেরা ক্রমে ইংরেজ-রাজ্য আক্রমণ করে। দুইবার শিখে ও ইংরেজে যুদ্ধ হয়। শিখেরা খুব বীরের মত লড়িলেও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় উহারা হারিয়া যায়; শেষে ইংরেজরা পঞ্জাব দখল করিয়া লয়। শিখেরা ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং ক্রমে এত অনুগত হয় যে, মিউটিনি বা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় উহারা ইংরেজদের হইয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করে। ইংরেজদের দেশী পল্টনে এখনও অনেক শিখ কাজ করে। ইহারা খুব সাহসী, ইহাদের মত ঘোড়সওয়ার ও যোদ্ধা খুব কম আছে। পঞ্জাবে শিখদের অনেক তীর্থস্থান আছে। ঐগুলির মধ্যে অমৃতসরের মন্দির বা গুরুদ্বার প্রধান। ঐস্থানে একটি বিশাল পুষ্করিণীর মধ্যে একটি মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়াটি সোনার পাতে মোড়া। বড় হইলে তোমরা উহা দেখিতে যাইও।



কার্ডিন্যাল রিশল্যু

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আজ তোমাদের এমন একজন সন্ন্যাসীর কথা বলব, যিনি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের খুব উঁচুদরের সন্ন্যাসী হ'লেও ভগবানের উপাসনা নিয়েই দিন কাটান নি, বিরাট একটা রাজ্যের শাসনভার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং অসীম যোগ্যতার সঙ্গেই সে রাজ্যের উন্নতি-সাধন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যরক্ষার জন্য তরবারি ধারণেও কুণ্ঠিত হন নি।

সে অনেক দিনের কথা, ষোড়শ শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে; ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন রাণী এলিজাবেথ। ফ্রান্সের সিংহাসন নিয়ে মহা গণ্ডগোল চলছে। ভ্যালয় বংশের শেষ রাজা তৃতীয় হেনরী গৃহশত্রুর ভয়ে রাজধানী প্যারী ত্যাগ ক'রে গিয়ে তাঁর ভগ্নীপতি ন্যাভারের রাজা হেনরীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ন্যাভারের রাজা ছিলেন প্রোটেস্টাণ্ট, সুতরাং এই সংবাদে প্যারীর ক্যাথলিক প্রজারা ক্ষেপে উঠে সকলে মিলে ক্যাথলিক লীগের (ক্যাথলিক ধর্ম রক্ষার জন্য গঠিত সভা, এর সভাপতি ছিলেন ভ্যালয়দেরই এক জ্ঞাতি, এবং এদের ভয়েই রাজাকে প্যারী ত্যাগ করতে হয়েছিল) পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হোল এবং স্পেনের রাজার কাছে সাহায্য চাইলে। স্পেনের রাজাও ফ্রান্সের সিংহাসনলাভের এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয় ভেবে পত্রপাঠ বিপুল সৈন্যদল পাঠিয়ে প্যারী রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

দুই হেনরীর মিলিত বাহিনী যখন প্যারীর দিকে যাত্রা করল, তার দু-একদিন পরেই এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসী তৃতীয় হেনরীকে হত্যা ক'রে ভ্যালয় বংশের উচ্ছেদ করলে, বেচারী হেনরীকে আর প্যারীতে ঢুকতে হোল না। অবিশ্যি তাতে ক্যাথলিক লীগের কিছুই সুবিধে হোল না, কারণ ন্যাভারের রাজা হেনরী তখন সিংহাসন দাবী করলেন এবং প্যারী অবরোধ করলেন। ন্যাভারের রাজা তো শুধু ফ্রান্সের রাজার ভগ্নীপতি নয়, তাঁর পূর্বপুরুষ ঐ রাজবংশেরই ছেলে ছিলেন।

যাই হোক, প্রায় চার-বৎসর যুদ্ধবিগ্রহের পর ন্যাভারের রাজাই জয়ী হলেন এবং চতুর্থ হেনরী রূপে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন। অবিশ্যি এর জন্যে তাঁকে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম বিসর্জন দিতে হয়েছিল। চতুর্থ হেনরী খুব জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁর বিবিধ গুণের জন্য তাঁকে ইউরোপের মহান্ রাজা বলা হোত।

ফ্রান্সে যখন এই ঘোর দুর্দিন, ঘরে-বাইরে যখন অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে, তখন নিজের বাড়ীর

জানালায় ব'সে ব'সে বালক আর্মাণ্ড্, জীন ডুপ্লেসিস্* দেশের এই দুর্দশা দেখতেন আর মনে মনে কল্পনার জাল বুনতেন। ছেলেটি হোল রিশ্‌ল্যুর নাইট ফ্রান্সিস্ ডুপ্লেসিসের ছোট ছেলে এবং এই ছেলেটিই উত্তর-কালে কার্ডিন্যাল রিশ্‌ল্যু রূপে ফ্রান্স শাসন করেছিলেন।

আর্মাণ্ড বাল্যকালেই তাঁর নির্জন পল্লীভবন ছেড়ে প্যারীতে এলেন লেখাপড়া শেখার জন্য। কলেজ অব্ ন্যাভারে লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যা দুই-ই যেমন শিখতে লাগলেন, শহরের জনস্রোত ও বিবিধ বিচিত্র সমাজের মধ্যে থেকে মানুষকেও তেমন চিনতে শিখলেন। লেখাপড়া তিনি ভালই শিখেছিলেন, ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর অল্প-বিস্তর দখল ছিল।

কলেজ যখন ছাড়লেন তখন তাঁর বাবা বেঁচে নেই, আর্মাণ্ড তখন মার্কু'ইস্ অব্ চিলন; সুতরাং রাজসভায় সভাসদরূপে প্রবেশ করতে তাঁর কোনই বাধা রইল না। রাজসভাতে যাতায়াত শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি রাজসভায় ছড়িয়ে পড়ল; কারণ তরবারি চালনা, অশ্বারোহণ ও নৃত্যবিদ্যা, যে ক'টা গুণ তখনকার দিনে সভাসদদের থাকা অবশ্য প্রয়োজন ছিল, সব ক'টাতেই তরুণ মার্কু'ইস ছিলেন নিপুণ। তাছাড়া তিনি দেখতেও ছিলেন সুশ্রী, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর মুখ ও একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ,—যে দেখত সে আর সহজে ভুলতে পারত না।

রাজসভায় গিয়ে রিশ্‌ল্যু যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবের কথা ভাবতেন এবং কল্পনায় নিজেকে সে গৌরবের অধিকারী দেখতেন, কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভেঙে গেল যখন তাঁর মা ব'লে পাঠালেন যে, তাঁকে সন্ন্যাস নিতে হবে!

ওঁদের জেলার প্রধান ধর্মযাজক ওঁদের বংশেরই কেউ হবে, এই ছিল প্রথা। রিশ্‌ল্যুর যে বড় ভাই-এর ঐ পদ নেবার কথা ছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত নিতে রাজী না হওয়ায় রিশ্‌ল্যুকেই বিশপের পদ নিতে হোল। এতে একদিকের উচ্চাশা যেমন কম্‌ল, আর-একদিকের তেমনি বাড়ল। কারণ তখন খ্রীশ্চানদের ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতা অসীম; বিশপ থেকে কার্ডিনাল আর কার্ডিনাল থেকে পোপ—এ আর এমন বেশী কথা কি?

কিন্তু বিশপ হবার কিছুদিন পরেই তিনি শহর ছেড়ে নিজের জমিদারীতে ফিরে এলেন। অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীগ্রাম, উপাসনার মন্দিরটা পর্যন্ত যুদ্ধে ভেঙে গিয়েছিল। যাই হোক্, রিশ্‌ল্যু প্রজাদের উন্নতি সাধনের জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন; তাদের খাজনা কমানোর জন্য রাজসরকারে লেখালেখি করতে লাগলেন; যা দু-চারজন প্রোটেস্টাণ্ট ছিল, তাদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিলেন এবং অধীনস্থ পুরোহিতদের ওপর কড়া নজর রেখে তাদের নানা রকম দুষ্কার্য বন্ধ করে দিলেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বালক রাজা ত্রয়োদশ লুই স্পেনে যাচ্ছিলেন রাজকুমারী অ্যানিকে বিবাহ করতে; পথেই রিশ্‌ল্যুর জমিদারি, তিনি রাজা ও তাঁর পার্শ্বচর সৈন্য-সামন্তদের এমনই অভ্যর্থনা করলেন এবং আতিথেয়তা দেখালেন যে, অবিলম্বে তাঁকে নূতন রাণীর ধর্মযাজকের পদ দেওয়া হোল এবং ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ক'রে নেওয়া হোল। ভাগ্যদেবতা এই যে রিশ্‌ল্যুর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলেন, সে চোখ আর তিনি ওঁর জীবদ্দশাতে কখনই ফেরান নি।

---

* ছেলেদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণ দেওয়া হোল।

ত্রয়োদশ লুই দেহে এবং মনে বাপের কোনও গুণই পান নি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, আর তা ছাড়া তখনও তাঁর সাবালক হবার কিছু বিলম্ব ছিল, রাজ্যের অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করতেন তাঁর মা, মেরী দ্য মেদিস, এবং মেরীকে পরিচালিত করতেন তাঁর ইটালিয়ান পার্শ্বচর কন্‌সিনি। রিশ্‌ল্যু এ সমস্ত খবরই রাখতেন, তাই কন্‌সিনি ও মেরীর মন যুগিয়ে নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিতে ওঁর একটুও দেরি লাগল না। কিন্তু বিপদ বাধল তখনই, যখন দেশের লোক কন্‌সিনির অত্যাচারে ক্ষেপে গিয়ে তাকে হত্যা করলে। ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ লুইয়ের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে তাঁর এক শিকারী বন্ধুর হাতে গিয়ে পড়েছিল ; তাঁর ভয়ে মেরী প্যারী থেকে পালিয়ে গিয়ে এক দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং রিশ্‌ল্যুকেও আবার নিজের দেশে ফিরে আসতে হোল।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন গেল না। কিছুদিন পরেই রাজার ঐ শিকারী বন্ধুটি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা গেল। রিশ্‌ল্যু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানীতে ফিরে এলেন, কিন্তু তখন আর তিনি বিশপ্‌ নন ; তখন তিনি প্রাণপণ চেস্টা আর তদ্বিরে কার্ডিনাল রিশ্‌ল্যু হয়েছেন। কার্ডিনালের পদগৌরব পোপের নীচেই এবং একজন পোপ মারা গেলে ঐ কার্ডিনালদের মধ্যেই পোপ নির্বাচিত হন। রিশ্‌ল্যু রাজসভায় এসে খুব শীগ্‌গিরই নিজের প্রতিভাবলে আর-সবাইকে ম্লান ক'রে দিলেন ; রাজারও তাঁর ওপর এত বিশ্বাস হোল যে, অবশেষে একদিন রিশ্‌ল্যুকে ডেকে তিনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলেন এবং তাঁকেই নিজের মনের মতন ক'রে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন। লোক-দেখানো অনিচ্ছার সঙ্গে সেই যে রাজ্যের শাসন-রশ্মি রিশ্‌ল্যু হাতের মধ্যে তুলে নিলেন তা ইহজীবনে আর কোনদিনই তাঁর বজ্রমুষ্টি থেকে স্খলিত হয় নি।

রিশ্‌ল্যু যখন রাজ্যভার পেলেন তখন ফ্রান্স অত্যন্ত দুর্বল ; অন্তর্বিপ্লব, বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় একেবারে ক্ষতবিক্ষত ; রিশ্‌ল্যু প্রথমেই অন্তর্বিপ্লব থামাবার দিকে মন দিলেন। ফ্রান্সে প্রোটেস্টাণ্ট তখন মুষ্টিমেয়—কিন্তু তাদের কাছ থেকেই বিপদের আশঙ্কা বেশী তা বুঝতে পেরে তিনি তাদের প্রধান যা আড্ডা, লা রোসেল ব'লে ছোট দ্বীপটি, অবরোধ করলেন। ঐখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, সেই দুর্গ আর ইংলণ্ডের সাহায্য, এই দুই ভরসায় দ্বীপের অধিবাসীরা প্রথমে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে চায় নি ; কিন্তু ইংলণ্ডের রণতরী দ্বীপে পৌঁছবার বার বার বৃথা চেস্টা ক'রে ফিরে যেতে বাধ্য হোল, এধারে খাবার জিনিসের আমদানি গেল একেবারে বন্ধ হয়ে। আর উপায় কি ? রিশ্‌ল্যু বিজয়গর্বে দুর্গের মধ্যে ঢুকে ক্যাথলিক নিয়মানুসারে উপাসনা করলেন, তারপর ঐ দুর্গ ভেঙে সমভূম ক'রে ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিলেন। কিন্তু তিনি তাদের ওপর আর কোনও অত্যাচার করেন নি বা তাদের ধর্মবিশ্বাসেও আঘাত করেন নি।

এর পরে রিশ্‌ল্যু দেশের বড় জমিদারদের শক্তিক্ষয়ে মন দিলেন। বড় বড় জমিদাররা আগে নিজেদের দুর্গ এবং সৈন্যসামন্ত রাখতেন এবং সুযোগ পেলেই রাজার সঙ্গে শত্রুতাসাধন করতেন। এদের অধিকাংশেরই দুর্গ ভেঙে, সৈন্য-সংখ্যা কমিয়ে দুর্বল ক'রে দেওয়া হোল এবং দু'একজনকে অবাধ্যতার এমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হোল যে, একে একে সকলেই রিশ্‌ল্যুর আধিপত্য স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হলেন। সাধারণ আইন নিতান্তই সাধারণের জন্য আগে তাঁদের এই ধারণা ছিল, কিন্তু সে ভুলও রিশ্‌ল্যু তাঁদের ভেঙে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন যে, "রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন"—তার কাছে জমিদার ও প্রজা দুই-ই সমান।

স্পেনের স্পর্ধা কোনদিনই রিশ্‌ল্যু ভোলেন নি, এইবার তিনি সেই দিকে মন দিলেন। সামান্য

একটা ছুতোয় তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং নিজে সৈন্যের পুরোভাগে বর্মাবৃত অবস্থায়, তরবারি হাতে নিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। এই যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে রাজাও গিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্পেন আর স্যাভয়ের মিলিত বাহিনীকে যুদ্ধে হারাবার পর রাজা এলেন রাজধানীতে ফিরে, কিন্তু কার্ডিনাল দক্ষিণের প্রোটেস্টাণ্টদের বিদ্রোহ-দমনে মন দিলেন। এবারে প্রোটেস্টাণ্টদের তিনি এমনই শাসন করলেন যে, বহুকাল পর্যন্ত তাদের আর মাথা তুলতে হয় নি।

বাইরের শত্রুদের দমন ক'রে রিশ্‌ল্যু ফ্রান্সের গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নিজেকেও লোকচক্ষুতে যথেষ্ট বড় করলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু বেড়েই গেল। তাঁর প্রতিপত্তিতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল—এবং তাঁর উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। রাজমাতা মেরী, গির্জার বড় বড় পাদরীরা ও জমিদাররা সকলেই তাঁর উচ্ছেদ কামনা করতেন। লোকে বলে যে, রাণী অ্যানিও তাঁর প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতেন না, এমন কি স্বয়ং রাজারও এক-এক সময় মন্ত্রীর শাসন অসহ্য লাগত। কিন্তু রিশ্‌ল্যুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এইসব অগণিত শত্রুর মধ্যেও বরাবর তাঁকে রক্ষা করেছে। তাঁর গোয়েন্দা-বিভাগ খুব ভাল ছিল, তিনি তাদের কাছ থেকে কোনও ষড়যন্ত্রের খবর পেলেই, ছলে-বলে-কৌশলে ঐ ষড়যন্ত্রের পাণ্ডাদের কঠিন শাস্তি দিতেন, তাদের পদমর্যাদা বা বংশগৌরবের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করতেন না।

একবার রাজা লুই-এর মরণাপন্ন অবস্থা হয়। চিকিৎসকরা সকলেই বললেন যে, জীবনের কোনও আশাই নেই। কার্ডিনালের শত্রুপক্ষের উল্লাসের আর সীমা রইল না। এমন কি নতুন রাজার রাজত্বে কিভাবে রিশ্‌ল্যুকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে এবং কে পদ পাবে তা পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু রাজা শেষ পর্যন্ত সেরে উঠলেন। রাজমাতা মেরী তাতেও হাল না ছেড়ে তাঁর রোগশয্যায় তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে, ভাল হয়ে উঠেই তিনি রিশ্‌ল্যুকে জবাব দেবেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে রাজা সে সব প্রতিজ্ঞা একেবারে ভুলে গেলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন উল্লাসের সঙ্গে রিশ্‌ল্যুর প্রাণদণ্ডের আশা করছে, তখন এল তাদেরই প্রাণদণ্ড এবং নির্বাসনের আদেশ!

এরপর কার্ডিন্যাল আরও কঠিন হস্তে রাজ্যের রশ্মি ধরলেন এবং নির্মমভাবে সমস্ত শত্রুদের দমন করলেন। আরও কিছুদিন ধ'রে, আর কিছুদিন ধ'রেই বা কেন, আমরণ তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল, কিন্তু উনিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি যখন অন্তিম শয্যায় চোখ বুজলেন তখন তাঁর শ্রম সার্থক, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত ইউরোপকে মেনে নিতে হয়েছে। যে বিশ্বাসের বলে রাজা তাঁর হাতে রাজ্যের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি চিরদিন প্রাণপণে রেখেছিলেন।

রিশ্‌ল্যুর মৃত্যুর পর রাজাকে বেশীদিন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও মন্ত্রীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয় নি, কয়েক মাস পরেই তিনিও মারা গেলেন। আজও তোমরা ফ্রান্সে গেলে দেখবে পাশাপাশি এই দুই বন্ধুর মর্মরমূর্তি সেখানে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁদের এই অপূর্ব বিজয়বার্তার কথা ঘোষণা করছে!



গুরু অমরদাস

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

॥ ১ ॥

সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ভীষণ ঝড় বহিতেছে। বৃষ্টির বিরাম নাই, ঝম্ ঝম্ শব্দে বারিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। বিপাশা নদীর বুকে ঢেউগুলি নাচিয়া নাচিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িতেছে। কোথাও বা মড়্ মড়্ শব্দে গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বজ্রের কড়্ কড়্ ধ্বনি, বিদ্যুতের চমকানি—সেই রাত্রিকে অতিশয় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। সেই ভয়ানক রাত্রিতে নির্জন পথ দিয়া একজন লোক বিপাশার পবিত্র জলে একটি কলসী পূর্ণ করিয়া গ্রামের পথে যাইতেছিল। লোকটি বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখিয়া চলিতেছে। কখনও ঠিক পথে চলিতেছে, কখনও বা বনে-জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সে পথ ভুলিয়া একটি গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। সেই গর্তের অল্প দূরে ছিল এক তাঁতীর বাড়ী। লোকটির পড়ার ভীষণ একটা শব্দ শুনিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া উঠিয়া সে বলিল—'এত রাত্রিতে ঝড়জলের মধ্যে কোন্ হতভাগা খানায় পড়িল!' তাহার স্ত্রী কহিল, 'কে আর হইবে? বোধ হয় হতভাগা গৃহহারা অমরু তাহার গুরুর স্নানের জল লইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া খানায় পড়িয়াছে!'

এই অমরু কে ছিলেন এইবার তাঁহার কথা শোন।—

অমৃতসরের কাছাকাছি বাসরকি নামক গ্রামে অমরদাসের জন্ম হয়; সে প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। অমরু ছেলেবেলায় তেমন লেখাপড়া কিছুই শিখেন নাই। গ্রামে থাকিয়া চাষবাস করিয়া, কখনও বা ব্যবসায় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। অমরের বয়স যখন চব্বিশ বৎসর, তখন রাস কোঁয়র নামক একটি মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল।

অমরু ছিলেন সাদাসিধে ধরণের লোক। একপ্রস্থ কাপড় পরিয়া দিন কাটাইতেন এবং যেদিন যাহা উপার্জন করিতেন তাহা দিয়া সংসার চালাইতেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কোনরূপ জীবহত্যা করিতেন না এবং শুধু নিরামিষ খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। গ্রামে গ্রামে মরীচ, লবণ প্রভৃতি বিক্রয়

করিয়া যে সামান্য রোজগার হইত তাহাতেই তাঁহাদের চলিয়া যাইত। এই সাধু ব্যবসায়ীর সততার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

এমনি সহজ সরল ভাবে অমরদাসের জীবনের প্রায় ষাট বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর অমরু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেন—কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে ছিল দারুণ অশান্তি। মনের মত গুরু মিলল না।

একদিন রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। রাত্রিশেষে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন একজন রমণী অতি মধুর স্বরে স্তোত্র গাহিতেছেন। গানের প্রত্যেকটি কথা অতি সুন্দর ও ভক্তিভাবপূর্ণ। অমরুর কাছে গানের সুর এবং গানের প্রত্যেকটি পদ এক অজানা পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছিল। তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে, এই মহিলাটি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী। ইঁহার নাম বিবি অম্‌রো। অম্‌রো শিখদের গুরু অঙ্গদের কন্যা আর যে সঙ্গীতটি তিনি গাহিতেছিলেন ঐটি গুরু নানকের রচিত একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত। ঐ গানটির পদ এইরূপ—'রাসায়নিক ক্রিয়ায় তামা যেমন সোনা হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিলে অতিবড় যে মন্দ লোক সেও সৎ হইতে পারে।'

অমরদাস সেই বধূটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা, তোমার গুরু কে?' বিবি অম্‌রো বলিলেন,—'আমি গুরু নানকের এই স্তোত্রটি শিখিয়াছি আমার বাবা গুরু অঙ্গদের কাছে। তিনিই এখন শিখদের গুরু।'

অমর বলিলেন,—'তুমি কি আমাকে তোমার বাবার কাছে লইয়া যাইতে পার?'

সে কহিল—'কেন পারিব না?' তারপর দুইজনে একদিন গুরু অঙ্গদের চরণপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ সময়ে গুরু অঙ্গদ খাতুর নামক স্থানে বাস করিতেন। গুরু অঙ্গদের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়া অমরদাসের মনের সমুদয় সন্দেহ দূর হইল। যে সত্যের সন্ধানে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, তিনি সেই সত্যের পথ খুঁজিয়া পাইলেন। সেইদিন হইতে অমরদাস হইলেন একজন ধর্মপ্রাণ শিখ। সেদিন হইতে তাঁহার মনে নিয়ত ধ্বনিয়া উঠিত—'জয় অলখ নিরঞ্জন!'

॥ ২ ॥

ভক্ত অমরদাস হইলেন গুরু অঙ্গদের অন্তরঙ্গ সেবক ও ভক্ত; বারো বৎসর কাল প্রাণ দিয়া গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন, ভিক্ষা করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, পানীয় জল সংগ্রহ করিতেন, আর গুরু অঙ্গদের স্নানের জল আনিতেন দুই ক্রোশ দূরবর্তী বিপাশা নদী হইতে। সেই দুর্যোগের রাত্রিতে অমরদাস যে পা পিছলাইয়া গর্তে পড়িয়া গিয়াছিলেন, সে কথাটা গুরু অঙ্গদের কানে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁতীর স্ত্রীর সেই শ্লেষ, 'বেচারা ঘরহারা অমরু ছাড়া কে আর এমন দুর্যোগের রাত্রিতে পথে বাহির হইবে বল?' গুরু এই কথা কয়টিও শুনিয়াছিলেন।

একদিন তিনি শিখদের ডাকিয়া বলিলেন—'শোন তোমরা ! অমরদাস গৃহহীন পথের ভিখারী নহে, সে আজ হইতে গৃহহীন হতভাগ্যদের আশ্রয়স্বরূপ হইবে।' এই কথা বলিয়া তিনি ভক্ত অমরদাসকে সকলের সম্মুখে আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ গুরুদেবের সহিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—'জয় অলখ নিরঞ্জন !'

সেদিন হইতে অমরদাস অঙ্গদের পরবর্তী গুরু বলিয়া গণ্য হইলেন। গুরু অঙ্গদের দুই পুত্র দাতু এবং দাসুর কাছে তাঁহাদের পিতার এই ব্যবস্থাটা একেবারেই ভাল লাগিল না। অবস্থা বুঝিয়া—শান্ত ও ভক্ত অমরদাস খাডুর ছাড়িয়া গোইন দোয়াল নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন।

॥ ৩ ॥

গুরু অঙ্গদের মৃত্যুর পর গুরু অমরদাস নিশ্চিন্ত মনে গোইন দোয়ালে স্থাপিত আপনার গদীতে বসিয়া ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন। শিখেরা সব দলে দলে আসিয়া এই মহাপুরুষকে ঘিরিয়া শিখধর্মের কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন।

একদিন দাতু আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে অমরদাসের প্রতি শিখদের এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল এবং পরশ্রীকাতর এই দুর্দান্ত যুবক গুরু অমরদাসকে পদাঘাত করিয়া আসন হইতে নামাইয়া দিল। এই অপমানে শিখগণ হৈ হৈ করিয়া উঠিল। অমরদাস এতটুকুও বিচলিত হইলেন না,—তিনি সস্নেহে দাতুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'ভাই দাতু, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত বৃদ্ধকে কি এত জোরে লাথি মারিতে আছে ? তোমার কোমল পা-খানিতে না জানি বুড়ো হাড়ের ঘায়ে কত বেদনা লাগিয়াছে। এস হাত বুলাইয়া দেই।' দাতু বৃদ্ধের এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন—অমরদাসের চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন—'আমায় ক্ষমা করুন। সত্যই আপনি গুরু হইবার যোগ্য।'

॥ ৪ ॥

গুরু অমরদাস বিনয়ের আদর্শ ছিলেন। কেহ যদি তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিত, অত্যাচার ও নির্যাতন করিত, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন। শিখদিগকে বলিতেন—'যদি তোমাদের প্রতি কেহ অন্যায় ব্যবহার করে, বিচলিত হইও না। একবার, দুইবার, তিনবার সেই অপমান সহ্য কর, পরে দেখিতে পাইবে যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সেই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।'

সমাজ-সংস্কারে গুরু অমরদাস ছিলেন একজন অগ্রণী। সেকালে সতীদাহের প্রচলন ছিল বাড়ী বাড়ী—গ্রামে গ্রামে। অমরদাস এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া উহার অনেকটা দমন করেন। যেখানে অন্যায় ও অত্যাচার দেখিতে পাইতেন, সেখানেই বৃদ্ধ অমরদাস তাহার প্রতিবিধানের জন্য অগ্রসর হইতেন।

সমাজে একজন উচ্চ একজন নীচ এই যে বিভেদ, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কেহ ছোট, কেহ বড়, এইরূপ অসামঞ্জস্য তাঁহার মনকে পীড়া দিত। অস্পৃশ্যতার তিনি বিরোধী ছিলেন; মানুষ মানুষ,

সকলে সমান, এই নীতি ঘোষণা করিয়া শিখদের মধ্যে এক মহামিলনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে খাইতে, একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং নিজ জীবনেও তাহা পালন করিয়াছিলেন।

শিখধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে বাইশটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। অমরদাসের পুত্রেরা উপযুক্ত না হওয়ায় তিনি জামাতা রামদাসকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অমরদাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তিনি শিখদের বলিয়াছিলেন—'বন্ধুগণ, তোমরা আমার জন্য অশ্রুজল ফেলিও না,—সেই পরম পিতা ঈশ্বরের গুণগান করিও।' 'জয় অলখ নিরঞ্জন' বলিতে বলিতে তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন।





খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানিস্তানের গোমল নদীর দক্ষিণ তীরে ইব্রাহিম সুর নামে এক অশ্ব-ব্যবসায়ী বাস করিতেন। তাঁহার বাসস্থানের অদূরেই বিখ্যাত গোমল গিরিপথ। এই পথ দিয়া তখন বিস্তর আফগান ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অনেকেই বিলক্ষণ লাভবান হইতেন। কিন্তু ইব্রাহিমের ভাগ্য সেরূপ সুপ্রসন্ন ছিল না। লাভ হওয়া দূরে থাক, ব্যবসায়ে তিনি এতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, শেষে বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার পুত্র হাসানের সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিবার মানসে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন এবং দিল্লীর সন্নিকটে হিস্‌সার ফিরোজা নামক নগরে জমাল খাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলেন। এই নগরেই সম্ভবত ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফরিদ জন্মগ্রহণ করেন। এই ফরিদই উত্তরকালে সুবিখ্যাত সম্রাট শের-শাহ নামে পরিচিত হন।

কিন্তু ফরিদের বাল্যকাল সুখে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম শেষ বয়সে এক জায়গীর লাভ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হাসান তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হন। হাসানের চারিটি স্ত্রী ছিলেন। ফরিদ ও তাঁহার সহোদর নিজাম হাসানের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হাসান তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি এত অধিক অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বাল্যকালে ফরিদ ও নিজাম তাঁহার আদর হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। হাসানের প্রভু জমাল খাঁ কিছুকাল পরে দিল্লী-সাম্রাজ্যের পূর্ব-প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া হাসানকে বিহার-প্রদেশের অন্তর্গত সাসারাম ও আরও একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং হাসানও সাসারামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এইরূপে পিতার অবস্থার উন্নতি হইলেও ফরিদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। অবশেষে ফরিদ পিতার বিরাগ সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব-প্রদেশের রাজধানী জৌনপুরে জমাল খাঁর নিকট পলাইয়া আসিলেন। তখন

তাঁহার বয়স পনের বৎসর মাত্র।

ফরিদ এইরূপে চলিয়া আসিবার পর হাসানের চক্ষু ফুটিল। তিনি তৎক্ষণাৎ জমাল খাঁকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, ফরিদের বিদ্যাশিক্ষা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অতএব তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ফরিদকে অবিলম্বে সাসারামে পাঠাইয়া দেন। জমাল খাঁও সেই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অভিমানী পুত্র কিছুতেই পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"পিতা যদি কেবল আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজধানী ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেলে কি বেশী সুবিধা হইবে?" জমাল খাঁ এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন—ফরিদকে আর ফিরিয়া যাইতে জেদ করিলেন না। তখন ফরিদও খুব মন দিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আরবি ও ফারসি ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল সাহিত্যচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের জন্যও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফলে তিনি রাজ্যের হিসাব-পত্রাদি, সাধারণ প্রজার অবস্থা এবং তাহাদের প্রতি সৈনিক-জায়গীরদারের ও মকদ্দমদের (অর্থাৎ রাজস্ব-সংগ্রাহকদের) অত্যাচার সম্বন্ধে যে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের বীজ স্বরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে যখন হাসান জৌনপুরে জমাল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন চারিদিক হইতে পুত্রের সুখ্যাতি শুনিয়া তিনি এত তৃপ্তিলাভ করিলেন যে, তিনি ফরিদকে সাসারামে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া স্বীয় জায়গীরের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার উপরেই অর্পণ করিলেন। এই সময়ে ফরিদ তাঁহার পিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সকল শাসকেরই মনে রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "সুশাসনের মূলভিত্তি ন্যায়-বিচার। সমস্ত রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি ইহারই উপর নির্ভর করে। যে রাজ্যে ন্যায়-বিচার নাই তাহার ধ্বংস কেহ নিবারণ করিতে পারে না। আমি জানি, আমাদের যে সকল আত্মীয় ও সৈনিকগণকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছে, তাহারা, জমিদারেরা এবং মকদ্দমেরা দুর্বল প্রজাদের উপর কিরূপ অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে। সেই অত্যাচারের দমন করাই হইবে আমার প্রথম কার্য। এ বিষয়ে যদি আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি এ গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিব না।" তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

সাসারামে উপস্থিত হইয়াই ফরিদ দৃঢ়হস্তে জায়গীরদার, জমিদার ও মকদ্দমগণের অত্যাচার দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রত্যেক প্রজার ন্যায্য দেয় স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যদি কেহ তাহার অতিরিক্ত একগাছি তৃণও গ্রহণ করে তাহা হইলে সে দণ্ডিত ও পদচ্যুত হইবে। তাঁহার এই আদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া যখন কয়েকজন শক্তিশালী সৈনিক-জায়গীরদার ও জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন, তখন তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি পূর্বে কখনো যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করেন নাই, তথাপি তিনি অবিলম্বে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং বিশেষ দক্ষতা সহকারে তাহাদিগকে একে একে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর সমগ্র জায়গীরের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে আর তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইল না।

কিন্তু ফরিদের এই সাফল্যলাভ তাঁহার পূর্বোক্ত বিমাতার অসহ্য হইল। তিনি ফরিদকে তাড়াইয়া তাঁহার স্থলে আপন পুত্র সুলেমানকে জায়গীরের ভার দিবার জন্য দিবারাত্র বৃদ্ধ হাসানকে অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার হাত এড়াইতে না পারিয়া হাসান ফরিদের দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার সামান্য ত্রুটির কথাও হাসানের কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু ফরিদ তাঁহার বিমাতা ও পিতার ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বেচ্ছায় জায়গীরের ভার পরিত্যাগ করিয়া আপন সহোদর নিজামের সহিত পাঠান সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি এক আমীরের সাহায্যে সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর অনুগ্রহ লাভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে হাসানের মৃত্যু হইলে সম্রাট ফরিদকে তাঁহার পৈতৃক জায়গীর সাসারামের শাসনভার অর্পণ করিলেন।

অবিলম্বে ফরিদ বিহারে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার জায়গীর অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু এই সময় সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর গর্বিত আচরণের ফলে তাঁহার অনেকগুলি আমীর ওমরাহ তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বিহারের শাসনকর্তা বহার খাঁ লোহানি আপনাকে বিহারের সুলতান বা স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে ফরিদ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বহারও তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। একদিন ফরিদ বহারের সহিত শিকার করিতে গেলে সহসা এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। ফরিদ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বহস্তে তরবারি দ্বারা তাহার প্রাণবধ করিলেন। বহার তাঁহার সাহসিকতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে "শের খাঁ" উপাধি দিলেন। "শের" শব্দের অর্থ "ব্যাঘ্র" ও "খাঁ" শব্দের অর্থ "প্রভু"। এখন হইতে ফরিদ সাধারণের নিকট এই নামে পরিচিত হইলেন।

বহার কেবল তাঁহাকে উপাধি দিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপন নায়েব ও তাঁহার বালক পুত্র জলাল খাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শের খাঁও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে শের খাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা সুলেমান তাঁহাদের এক শক্তিশালী আত্মীয়ের সাহায্যে শের খাঁকে আবার তাঁহার জায়গীর হইতে বিতাড়িত করিলেন। শের খাঁ নিরুপায় হইয়া বাবরের সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন। বাবর ইহার কিছু পূর্বে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথ ক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শের খাঁর প্রভু বহারের মৃত্যু হইল এবং জলাল সুলতান হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিলেন।

যাহা হউক, শীঘ্র বাবর বিহারে আসিয়া শের খাঁকে তাঁহার জায়গীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জলালের মাতা পুনরায় তাঁহাকে বিহার রাজ্যের নায়েব নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে জলালের মাতার মৃত্যু হইল। তখন শের খাঁ তাঁহার স্থানে বালক রাজার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি বিখ্যাত চুনার দুর্গের অধিকারিণীকে বিবাহ করিয়া সেই সুদৃঢ় দুর্গের সহিত বিস্তর ধনসম্পত্তি লাভ করেন। সেই বৎসরেই বাবরের মৃত্যু হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন মোগলসম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন।

শের খাঁ তাঁহার অভ্যস্ত নীতি অনুসারে বিহার দেশ শাসন করিয়াছিলেন এবং দুর্বল প্রজাগণকে অত্যাচারীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে দেশটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধারণ

প্রজারা সকলেই সন্তুষ্ট ও তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল। কিন্তু রাজার আত্মীয় লোহানিবংশীয় কয়েকজন সর্দার তাঁহাকে বিলক্ষণ ঈর্ষা করিতেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব লোপের জন্য সতত চেষ্টা করিতেন। অবশেষে তাঁহারা কুমন্ত্রণা দিয়া জলালের মন তাঁহার প্রতি বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের কথায় ভুলিয়া অল্পবুদ্ধি-সুলতান তাঁহার হিতৈষী অভিভাবক শের খাঁকে সরাইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এমন কি, শের খাঁকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবারও আয়োজন করা হইল। কিন্তু শের খাঁ স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি-প্রভাবে তাঁহার শত্রুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন জলাল বুঝিতে পারিলেন যে, বিনা বলপ্রয়োগে শের খাঁকে সরানো যাইবে না। কিন্তু সে শক্তি জলাল বা তাঁহার পরামর্শদাতাদের ছিল না। সুতরাং এ কার্য করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গদেশের শক্তিমান সুলতান মামুদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং একদিন জলাল বিহার হইতে পলাইয়া গিয়া মামুদের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। মামুদও তৎক্ষণাৎ জলালের সাহায্যার্থ বৃহৎ এক সেনাদল শের খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে শের খাঁও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জলালের পলায়নের পর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া তিনিও একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মামুদের সৈন্যগণকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুরজগড়ে উভয় দলে সাক্ষাৎ হইল। শত্রুপক্ষ কেবল সংখ্যায় অধিক ছিল না, তাহাদের সহিত অনেক হাতী ও কামান ছিল। কিন্তু শের খাঁ অকুতোভয়ে তাহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধের পূর্বদিনে তাহাদের সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দিয়া পরদিন ঊষাকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল ও তাহাদের সেনাপতি ইব্রাহিম হত হইলেন। এই যুদ্ধের ফলে শের খাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়া গেল এবং সমগ্র বিহারে তিনি দেশের রক্ষাকর্তা বলিয়া অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইহার দুই বৎসর পরে শের খাঁ একটি প্রকাণ্ড বাহিনী গঠিত করিয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে তাঁহার রাজধানী গৌড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সুলতান মামুদ ভীত হইয়া তাঁহাকে তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু এ সন্ধি সত্ত্বেও সুলতান মামুদ শের খাঁর বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। শের খাঁ এ সংবাদ পাইয়া পর বৎসর পুনরায় বাঙ্গলায় আসিয়া গৌড় নগর অবরোধ করিলেন।

কিন্তু শের খাঁর এই দ্বিতীয় বার বাঙ্গলা আক্রমণের ফলে মোগলসম্রাট হুমায়ুনের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। শের খাঁ মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এরূপভাবে শক্তি-বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া হুমায়ুন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শের খাঁর দমনের জন্য তিনি অবিলম্বে বহু সৈন্য লইয়া বাঙ্গলা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি মস্ত একটা ভুল করিয়া বসিলেন—বরাবর বাঙ্গলায় না গিয়া তিনি মধ্যপথে চুনার দুর্গ অবরোধ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। এইরূপে শের খাঁ যে সময় পাইলেন তাহার মধ্যে তাঁহার সেনাপতিরা গৌড় অধিকার করিয়া সুলতান মামুদকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইয়া দিল।

হুমায়ুন চুনার অধিকার করিবার পর শের খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে, যদি তাঁহাকে বাঙ্গলাদেশের আধিপত্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি মোগল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতে ও

বাঙ্গলাদেশ হইতে দশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর দিতে সম্মত আছেন। হুমায়ুন প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেও পরে সুলতান মামুদের অনুরোধে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর তিনি সসৈন্যে বাঙ্গলায় গিয়া গৌড় পুনরধিকার করিলেন এবং শের খাঁর দমন সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেখানে কাল কাটাইতে লাগিলেন। শের খাঁ কিন্তু সেই অবসরে বিহারে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিম দিকে কনৌজ পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। এদিকে আগ্রায় হুমায়ুনের এক ভ্রাতা মির্জা হিন্দাল বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সকল সংবাদ শুনিয়া হুমায়ুন আর বাঙ্গলায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেখানে কিছু সৈন্য রাখিয়া তিনি তাঁহার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি বক্সারের নিকট পৌঁছিলেন, তখন সহসা একদিন শেষরাত্রে শের খাঁ তাঁহার শিবির আক্রমণ করিলেন। তখন মোগল সৈন্যরা সকলেই নিদ্রায় মগ্ন ছিল। শত্রুর চীৎকারে যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যে যেখানে পারিল পলাইতে আরম্ভ করিল। সম্রাটের দামামাধ্বনি শুনিয়া কেবল তিনশতজন সৈন্য তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। হুমায়ুন সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই শের খাঁর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার বাম বাহু আহত হইল, এবং তাঁহার অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহার একজন সৈনিক তাঁহার অশ্বের মুখ বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিল। হুমায়ুন গঙ্গা পার হইবার অভিপ্রায়ে সেই দিকে অশ্ব ছুটাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অশ্ব নদীতে নামিলে তিনি তাহার পৃষ্ঠ হইতে জলে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় এক ভিস্তি তাহার মশকে করিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। হুমায়ুন সেই মশকের সাহায্যে গঙ্গার অপর পারে পৌঁছিলেন, নতুবা সেইখানেই তাঁহাকে জীবন বিসর্জন দিতে হইত। যাহা হউক, তিনি অবশেষে অতিকষ্টে আগ্রায় পৌঁছিলেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এই যুদ্ধে তাঁহার প্রায় আট হাজার সৈন্য হত হইয়াছিল এবং তাঁহার বেগম ও শিবিরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলারা শের খাঁর হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। শের খাঁ কিন্তু সেই সকল মহিলাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে আদেশ দিয়াছিলেন কেহ যেন কোন স্ত্রীলোককে বন্দী না করে।

এইরূপে শের খাঁর আধিপত্য বাঙ্গলাদেশ হইতে কনৌজ পর্যন্ত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি "শাহ" (অর্থাৎ রাজা) উপাধি গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। তদনুসারে তখন হইতে তিনি "শের শাহ" নামে পরিচিত হইলেন।

হুমায়ুন আগ্রায় পৌঁছিয়াই শের শাহের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং পর বৎসর সেই সকল সৈন্য লইয়া শের শাহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে কনৌজের পরপারে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের দলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং এবারে সম্মুখ-যুদ্ধ হইলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। এ যুদ্ধেও শের শাহ তাঁহার রণদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া তথায় পাঠান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ুন ভারতে কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে পারস্যে চলিয়া গেলেন।

মোগল সিংহাসন অধিকার করিবার পর শের শাহ উত্তর ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলি অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে মালব, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি দেশ তাঁহার হস্তগত হইল।

রাজপুতানায় তখন মাড়বার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। সে রাজ্যকে বশে আনিতে শের শাহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ও নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, মাড়বারের পতনের পর আবু হইতে আজমীর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাজপুত দেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

শের শাহের শেষ কীর্তি বুন্দলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ জয়। এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ তখন ভারতে অল্পই ছিল। শের শাহ দুর্গটি অধিকার করিবার জন্য প্রায় সাত মাস ধরিয়া বিস্তর আয়োজন করিয়াছিলেন। দুর্গটি এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি তাহার পার্শ্বে একটি সমুচ্চ বুরুজ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর হইতে দুর্গের ভিতর বড় গোলা ও বোমা ফেলিবার ব্যবস্থা করেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দুর্গ আক্রমণ কার্যের পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু একদিন যখন সৈন্যরা দুর্গের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন একটি বোমা দুর্গ-প্রাচীরে লাগিয়া ফাটিয়া গেল ও ঠিকরাইয়া নীচে বোমার স্তূপে আসিয়া পড়িল। ফলে সেই স্তূপে আগুন লাগিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে শের শাহ স্তূপের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আগুনে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া গেল এবং মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকে শিবিরে লইয়া আসা হইল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার সেনাপতিকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন যে, যেমন করিয়া হউক তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে যেন দুর্গটি অধিকার করা হয়। তাঁহার এই আদেশ শুনিবামাত্র তাঁহার সমস্ত সৈন্য সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া গেল এবং সন্ধ্যার পূর্বেই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। শের শাহ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তাঁহার বদনমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার আশা পূর্ণ করার নিমিত্ত ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সাসারামে লইয়া গিয়া তাঁহার স্বনির্মিত সুন্দর সমাধিমন্দিরে কবরস্থ করা হয়। সেই মনোহর সমাধিমন্দির এখনও তাঁহার স্মৃতি বক্ষে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শের শাহ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের জীবনপথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল এবং সে সংগ্রামে তিনি কেবল নিজের প্রতিভাবলে জয়ী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কেমন করিয়া একজন সামান্য জায়গীরদারের অনাদৃত পুত্র কেবল নিজ বুদ্ধি ও বীর্যবলে শত সহস্র দুর্ধর্ষ শত্রু ও দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে অত বড় একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি আকবর, শিবাজী, নেপোলিয়ন প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হন নাই, অথচ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবামাত্র বহুদর্শী বড় বড় সেনাপতিরাও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্য জয় অপেক্ষাও দেশের শাসনপদ্ধতির সংস্কার দ্বারা শের শাহ ইতিহাসে উচ্চতর আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে যে সকল বাদশাহ রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা সেনানী ও সৈনিকদিগকে জায়গীর দিয়া পুরস্কৃত করিতেন এবং সেই সকল জায়গীরদারেরা ও তাঁহাদের কর্মচারীরা প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া যথেচ্ছভাবে খাজনা আদায় করিতেন। সম্রাটের খাস প্রজাদেরও কর নির্ধারিত ছিল না, যে সম্রাট যেরূপ মনে করিতেন তাহাই তাহাদের নিকট আদায় করিতেন। সম্রাট মহম্মদ তোগলক তাহাদের কর এরূপ বৃদ্ধি

করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বনে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রজা সম্পত্তিশালী হইলে পাছে বিদ্রোহী হইয়া উঠে—এই ভাবিয়া অনেক সম্রাট তাহাদিগের দরিদ্র করিয়া রাখাই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করিতেন। কিন্তু "প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল" ইহাই ছিল শের শাহের বিশ্বাস এবং তদনুসারে তিনি তাঁহার শাসন-প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন। ন্যায়-বিচার, অত্যাচারীর দমন ও প্রজা-রক্ষণই ছিল তাঁহার শাসননীতির মূলভিত্তি। কি ক্ষুদ্র জায়গীর, আর কি সাম্রাজ্য যেখানেই তিনি শাসনাধিকার পাইয়াছিলেন, সেখানেই তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গকে তিনি সাক্ষাৎভাবে সম্রাটের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচারী জায়গীরদারের হস্ত হইতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পরগণায় একজন শিকদার (বা শান্তিরক্ষক), একজন আমিন (বা রাজস্ব-সংগ্রাহক), এবং দুইজন কারকুন (বা লেখক) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুইজন কারকুনের একজন হিন্দীতে, আর একজন ফার্সিতে হিসাবপত্র, পাট্টা কবুলিয়ত প্রভৃতি লিখিত। আমিন প্রজাদের জমি জরিপ করিয়া তাহাদের দেয় খাজনা নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে পাট্টা দিতেন এবং কবুলিয়ত গ্রহণ করিতেন। শের শাহ ফসলের এক-চতুর্থাংশ মাত্র রাজার প্রাপ্য বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছিলেন এবং কেহ অন্যায় করিয়া প্রজাদের যাহা দেয়, তাহার অতিরিক্ত কিছু আদায় করিলে তাহাকে দণ্ডিত করিতেন। সাম্রাজ্যের হীনতম প্রজারও অভিযোগ-অনুযোগ তিনি সকল সময় শুনিতেন ও প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিতেন। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক-একটি 'পরগণা', কতকগুলি পরগণা লইয়া এক-একটি 'সরকার' গঠিত হইত। সরকারে যে সকল উচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা আপনাদের এলাকাস্থিত পরগণাসমূহের কর্মচারীগণকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। শের শাহের রাজস্ব-সংক্রান্ত এই সকল সুন্দর ব্যবস্থা আকবর প্রভৃতি মোগল সম্রাটেরা প্রায় পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও তাহার বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। সামরিক বিভাগও শের শাহ এইভাবে সংস্কার করিয়াছিলেন। পূর্বে সম্রাটের সহিত সাধারণ সৈনিকদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। তাহারা সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইত এবং তাঁহাদিগকেই প্রভু বলিয়া মনে করিত। সুতরাং সেই সকল সেনাপতি ও শাসনকর্তারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের সাহায্যে সহজেই সম্রাটকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে পারিতেন। শের শাহ এ প্রথা তুলিয়া দিয়া সাধারণ সৈনিকগণকেও নিজে নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের বেতনাদি নিজে দিতেন। এইরূপে তিনি সেনাপতিদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাঁহাদিগকে সম্রাটের আদেশমত কার্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

শের শাহ চিরদিনই দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্রের জন্য অনেকগুলি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের অন্ধ ও অনাথদিগের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, সেইখানে তাঁহার রন্ধনশালা সকলের জন্য মুক্ত করিয়া দিতেন ও প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেখানে উদর পুরিয়া আহার পাইত। তাঁহার ন্যায়বিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি "সুলতান উল্‌ আদল্‌" (অর্থাৎ ন্যায়বিচারী সুলতান) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং সে উপাধির মর্যাদা রক্ষা করিবার সতত চেষ্টা করিতেন। তিনি বিচারের সময় বড়-

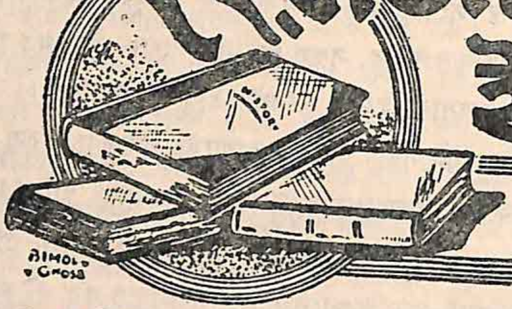
ছোট বা হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র ভেদ করিতেন না। কথিত আছে, একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক প্রজার স্ত্রীর প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রাজপুত্রের নামে শের শাহের নিকট অভিযোগ করিলে সম্রাট তৎক্ষণাৎ আদেশ দেন অভিযোক্তা যেন রাজপুত্রের সম্মুখে রাজপুত্রের স্ত্রীর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া তাহার অপমানের প্রতিশোধ লয়। তাঁহার এইরূপ ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতার ফলে রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ ক্রমশ তিরোহিত হইয়া তাহারা একজাতিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি অমন ঘোর অশান্তিপূর্ণ কালেও তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অপূর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শের শাহ নাম সার্থক হইয়াছিল। দেশের সমস্ত চোর ডাকাত বদমাশেরা তাঁহার নামে কাঁপিত। তখন জমিদার মকদ্দম প্রভৃতির মধ্যে অনেকে গুণ্ডা দস্যু বদমাশদিগকে প্রতিপালন করিত ও তাহাদের সাহায্যে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া অর্থশালী হইবার চেষ্টা করিত। শের শাহ একথা জানিতেন। সেইজন্য কোথাও চুরি ডাকাতি বা খুন হইলে তিনি সেই স্থানের জমিদার বা মকদ্দমকে দায়ী করিতেন। জমিদার ও মকদ্দমেরা সেই জন্য নিজ নিজ এলাকার বদমাশদের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন। ফলে দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, সে সময় পথিকেরা নির্জন পথেঘাটেও স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিত। এ কথা শের শাহের শত্রুরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "সম্রাট শের শাহের ভয়ে বাঘে ভেড়ায় এক ঘাটে জল খায়"—এ কথাটা একরূপ প্রবাদ বাক্যের মত চলিত হইয়া গিয়াছিল।

শের শাহের অন্যান্য কার্যের মধ্যে মুদ্রার সংস্কারসাধন ও পথনির্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শের শাহের পূর্বে প্রচলিত মুদ্রাগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল, নানারূপ ধাতু মিশ্রিত করিয়া সেগুলি তৈয়ারি হইত, তাহাদের ওজনের বা মূল্যের কিছুই স্থিরতা ছিল না। সুতরাং সেগুলির সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। শের শাহ সে মুদ্রাগুলির ব্যবহার নিষেধ করিয়া সুন্দরভাবে নির্মিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন এবং প্রত্যেক প্রকার মুদ্রার ওজন স্থির করিয়া দেন। তিনি যে প্রকার টাকা প্রচলিত করেন, বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই প্রকার টাকাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ব্যবসাবাণিজ্য, রাজকার্য ও পথিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে সকল সুন্দর সুদীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আজ পর্যন্ত তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। এই সকল রাস্তার মধ্যে ঢাকার সোনার গাঁও হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর রাজপথটি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। বর্তমান 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামক বিখ্যাত রাস্তাটি সেই রাস্তারই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। শের শাহ তাঁহার রাস্তাগুলির দুই পাশে বড় বড় বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রতি দুই ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া সরাই নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সরাইয়ের দুইটি বিভাগ থাকিত —এক ভাগ হিন্দুদের জন্য, অন্যটি মুসলমানদের জন্য। হিন্দুদিগকে জল ও আহার দিবার জন্য প্রতি সরাইয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সরাইয়ে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ও ঘোড়ার খাবার, ঠাণ্ডা ও গরম জল ও বিছানা সর্বদা প্রস্তুত থাকিত ও আগন্তুকমাত্রকেই তাঁহার পদমর্যাদা অনুসারে আহার্যাদি যোগাইবার জন্য শের শাহের আদেশ দেওয়া ছিল। সরাইয়ের ধারে একটি করিয়া কূপ ও মসজিদ তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সরাইয়ের দ্বারা রাজ্যের আরও অনেক কাজ হইত। প্রথমত, রাজার সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রা-

কালে এই সকল সরাইয়ে আহার ও বিশ্রামাদি করিতে পারিত, সেজন্য নিকটস্থ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিবার প্রয়োজন হইত না। দ্বিতীয়ত, সরাইগুলি ডাকচৌকিরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক সরাইয়ে দুইটি করিয়া ঘোড়া থাকিত, সেই ঘোড়ায় সংবাদ-বাহকেরা পরবর্তী সরাইয়ের সংবাদ লইয়া যাইত। এইরূপে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সংবাদ অতি সহজে এবং যতদূর সম্ভব সত্বর গিয়া পৌঁছিত এবং শের শাহ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে স্থানেই থাকুন অপর সকল স্থানের সংবাদ রীতিমত পাইতেন এবং তদনুসারে ব্যবস্থা করিতেন। সরাইগুলির দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রত্যেক সরাইয়ের কাছে বাজার বসিত এবং নিকটস্থ গ্রামবাসীরা এই সকল বাজারে তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইত। এইরূপ রাস্তা থাকাতে বণিকদের সাম্রাজ্যের সর্বত্র মালপত্র লইয়া যাইবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। পূর্বে যে যে প্রদেশের ভিতর দিয়া মাল লইয়া যাওয়া হইত সেই সকল প্রদেশেরই ব্যবসায়ীদিগকে মাশুল দিতে হইত। তাহা ভিন্ন ফেরিঘাট প্রভৃতি স্থানেও মাশুল আদায় করা হইত। সেই নিমিত্ত ব্যবসায়ীরা অধিক দরে মাল লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেন না। শের শাহ এ সমস্ত মাশুল তুলিয়া দিয়া কেবল বিক্রয়স্থানেই মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বণিকদের জন্য আরও অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

শের শাহ সাম্রাজ্য লাভ করিবার পর মাত্র পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং সে কয় বৎসর সতত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অথচ তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে উল্লিখিতরূপ যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজ্যের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় নিজে দেখিয়া-শুনিয়া সম্পন্ন করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় কী অসাধারণ বিবেচনাশক্তি ও কার্যদক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি সকল কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দিবারাত্রিকে কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন কার্য করিবার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করিয়া তিনি ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন প্রত্যহ রাত্রির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ অতীত হইলেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয় এবং তখন হইতে তিনি রাজকার্য আরম্ভ করিতেন। দিবারাত্র এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি কখনও কাতর হইতেন না এবং সকল কার্য এমন শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইত না। বাস্তবিত তাঁহার সকল কার্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের প্রথম কবির গল্প তোমাদের বলি। তোমরা হয়ত জানো যে, উত্তর সাগর পার হয়ে যাঁরা প্রথমে এসে ইংলণ্ডে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পৌত্তলিক। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার পরও প্রায় দু'শো বছর পর্যন্ত ইংলণ্ডের লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। তারপর রোম থেকে অগাস্টিন ব'লে এক খ্রীষ্টান সাধুপুরুষ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য ইংলণ্ডে এলেন। তাঁরই সাধনার ফলে দেখতে দেখতে ইংলণ্ডের অনেক রাজা, অনেক জমিদার ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন।

সেই সময় একদল লোক দেশ-দেশান্তর ঘুরে এই ধর্ম প্রচারের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। ঘরের সমস্ত সুখ ছেড়ে, খালি পায়ে, তাঁরা জীবন-মরণ পণ ক'রে য়ুরোপের নানান্ দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের বলতো মঙ্ক্ (monk), অর্থাৎ সন্ন্যাসী। এই সব সন্ন্যাসীদের জন্যে গ্রামে গ্রামে একরকম বাড়ী তৈরী হতে লাগলো—সেই ধরনের বাড়ীকে 'অ্যাবি' বা মঠ বলা হোত। সেই সমস্ত মঠে তাঁরা সমবেত হতেন, লোকজনেরা আসতো তাঁদের কথা শুনতে। এই সব মঠ ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

ইয়র্কশায়ারের হুইট্‌বী অঞ্চলে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথার ওপর ঠিক এই রকম একটি মঠ ছিল। যে সময়ের কথা আমরা বলছি, তখন হুইট্‌বীর এই মঠের খুব খ্যাতি ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে সাধু-সজ্জনেরা এই মঠে সমবেত হতেন।

সেই মঠের কর্তা ছিলেন একজন নারী। তাঁর নাম ছিল হিল্‌ডা। তিনি রাজবংশের মেয়ে ছিলেন ; কিন্তু রাজ-পরিবারের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

সেই মঠের কাছে এক অতি দরিদ্র কৃষকের ঘর ছিল। ক্যাডম্যান্ ব'লে তাদের একটি ছেলে ছিল। হিল্‌ডা ক্যাডম্যান্‌কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ক্যাডম্যান্ সেই মঠ থেকে সেখানকার কাজকর্ম করতো।

একদিন এক উৎসবের সময় নানা দূরদেশ থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা এসেছেন। কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, কেউ এসেছেন গরুর গাড়ীতে। সাময়িকভাবে একটা আস্তাবল তৈরী করা হয়েছে। ক্যাডম্যানের ওপর ভার পড়লো সেই আস্তাবল চৌকি দেওয়া—কেননা তখন গরু ঘোড়া ভয়ানক চুরি হতো।

ধর্ম-আলোচনার পর রোজ সন্ধ্যাবেলা সকলে সমবেত হয়ে গান গাইতে বসতো। একজনের গান

শেষ হয়ে গেলে বীণাযন্ত্রটি সে আর একজনের কাছে এগিয়ে দিত, সে তখন আবার গান আরম্ভ করতো। এই রকম ভাবে রাত্রি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন হতো। সকলেই সেই উৎসবে যোগদান ক'রে বীণা বাজিয়ে গাইতো। ক্যাডম্যান্ আস্তাবলে বসে বসে তাই শুনতো আর এক অপরূপ দুঃখে তার মন ভরে যেতো। তার আঙুলের ছোঁয়ায় কেন বীণা বাজে না? তার কণ্ঠে কেন সঙ্গীত নেই?

একদিন এই রকম মনের দুঃখে আস্তাবলে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে সে এক অপরূপ স্বপ্ন দেখলো। সে দেখলো এক দিব্যপুরুষ তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, তাকে ডেকে যেন কি বলছেন। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্পষ্ট শুনতে পেলো, সেই দিব্যপুরুষ বলছেন, ক্যাডম্যান্, ওঠ, আমাকে গান শোনাও!

বেদনায় ভেঙ্গে প'ড়ে ক্যাডম্যান্ বলে, প্রভু, গান গাইতে জানি না ব'লেই তো উৎসব থেকে দূরে, এই আস্তাবলে প'ড়ে কাঁদছি!

তবুও ক্যাডম্যান্ শুনলো দিব্যপুরুষ বলছেন, তুমি গান গাও, ক্যাডম্যান্!

বিমূঢ় বিস্ময়ে ক্যাডম্যান্ জিজ্ঞাসা করে, প্রভু, তবে ব'লে দিন আমি কি গাইবো?

"তুমি গাও, সেই নূতন দিনের কথা, যেদিন ভগবান এই পৃথিবীকে সৃজন করলেন! তুমি গাও সেই নূতন দিনের নূতন আলোর কথা!"

ক্যাডম্যান্ গাইতে আরম্ভ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথা থেকে জোয়ারের জলের মত তাঁর কণ্ঠে কথা আপনা থেকে আসতে লাগলো! শরৎকালের রাত্রির আকাশে যেমন ক'রে তারা ফুটে ওঠে, তেমনি ক'রে অপরূপ সব কথা তাঁর মনে আপনা থেকে যেন জ্বলে জ্বলে ফুটে উঠতে লাগলো।

স্বপ্নে ক্যাডম্যান্ গেয়ে চললেন, এই আকাশ, এই পৃথিবী, মেঘের ওপারে ঐ স্বর্গ, স্বর্গ ও পৃথিবী এক-ক'রে-দেওয়া আলো আর অন্ধকারের জন্ম-ইতিহাস!

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই প্রথমে মনে পড়ল রাত্রির সেই অপরূপ স্বপ্নের কথা। রাত্রিতে মাখা আতরের সুগন্ধ যেমন সকালেও থাকে, ক্যাডম্যান্ দেখলেন রাত্রিতে স্বপ্নে বলা সেই সব অপরূপ কথা জেগে উঠেও তাঁর স্পষ্ট মনে রয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছে!

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি হিল্‌ডার কাছে ছুটে গিয়ে সমস্ত কথা বললেন। হিল্‌ডা বুঝলেন যে, যে শক্তি গোপনে ফুলের বুকে মধু ভরে দেয়, সেই শক্তিই ক্যাডম্যানের মন সুরে ভরে দিয়েছে।

সেই মঠে থেকে ক্যাডম্যান্ লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। কে যেন দ্রুত, অতি দ্রুত তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বাইবেলের পুরানো গল্পগুলিকে তিনি কাব্যরূপ দিলেন। ঈশ্বরের মহিমা-গানে ইংরেজী কাব্যের যাত্রা আরম্ভ হলো। ক্যাডম্যানের কাব্যের প্রথম কয়ছত্র কবিতা শোন—

"Most right it is that we praise with our words,
Love in our mind, the warden of the skies,
Glorious kings of all the hosts of men;
He speed the strong and He is the head of all
His high creation, the Almighty Lord."

"—এই সব চেয়ে ভালো যে, আমাদের কথা দিয়ে আমরা যশ গাইতে পারলাম—
প্রেম রইলো মনে ভরা, যশ গাইলাম আকাশের চির-প্রহরীর,
রাজ-অধিরাজ নিখিল নর-লোকের ;
তিনি দিয়েছেন গতি প্রবলের বুকে, প্রবলতম তিনি—
তাঁরই বিরাট সৃষ্টি, সর্বশক্তিমান্ প্রভু !"

তোমরা যখন বড় হয়ে ইংরেজী কাব্যসাহিত্য পড়বে, তখন দেখবে যে, এই সুর যুগের পর যুগ, নানারূপে ইংরেজী কাব্যে ফুটে উঠেছে। ক্যাডম্যানের এই স্তব ইংরেজী কাব্যের ইতিহাসে তোমরা প্রায়ই শুনতে পাবে। কিন্তু ক্যাডম্যানই হলেন তার প্রথম উদ্‌গাতা।

ইংলণ্ডের প্রথম শিক্ষা-গুরু

তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে দেড়শো বছর আগেও, আমাদের দেশে, অর্থাৎ বাংলা-দেশে যাঁরা লেখাপড়া শিখতেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় বই লিখতে লজ্জাবোধ করতেন। আজও যে সে মনোভাব চলে গিয়েছে তা নয়। আজও আমাদের দেশে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা ইংরেজীতেই তাঁদের বই লেখেন এবং তাতে তাঁরা গর্ব অনুভব করেন। আবার ইংরেজদের দেশেও এমন একদিন ছিল যখন তাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজীতে বই লিখতে লজ্জাবোধ করতো। তাঁরা সব ল্যাটিন ভাষায় বই লিখতেন। তাতে ক'রে সাধারণ লোকেরা লেখাপড়া শিখতে পারতো না।

হুইটবীর মঠের মত প্রাচীন ইংলণ্ডে জারোতে একটা মঠ ছিল। সেই মঠে বীড ব'লে একটি অনাথ বালক লেখাপড়া শিখতো। বহু কষ্টে বীড কুড়ি বছরের মধ্যে দুরূহ ল্যাটিন ভাষায় বহু বিদ্যালাভ করলেন। সেই সময় তাঁর মনে একটা কথা জেগে উঠলো—যদি জনসাধারণই শিক্ষার সুযোগ না পেলো, তাহ'লে দেশের মধ্যে এক-আধজন পণ্ডিত থেকে কী লাভ ? জাতির শিক্ষার জন্যে বীড প্রাথমিক বই লিখতে বসলেন—যেমন আমাদের দেশে ক'রে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সারাজীবন এই কাজে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে তিনি ৪৫খানি স্কুলপাঠ্য বই তৈরী করলেন। বীডের মৃত্যুর পর চারশো বছর ধ'রে এই বইগুলিই ইংলণ্ডের কিশোরদের জ্ঞানের দুরূহ পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ঠিক করলেন যে, তিনি ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করবেন। সেণ্ট জনের বাণী থেকে তিনি আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ। তিনি বলে যেতে লাগলেন, আর তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র তাই লিখে নিতে লাগলো। কিন্তু তখন তাঁর ওপার থেকে ডাক আসছিল। কয়েকদিন অবিশ্রাম লেখানোর পর তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

ছাত্রটি বললে, এখন থাক।

অসুস্থ দেহে বিছানায় উঠে ব'সে বীড বললেন, না, তা হয় না।

কিন্তু তখন তাঁর সারাদেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তিনি ব'লে যেতে লাগলেন।

সহসা সমস্ত দেহ অবশ হয়ে উঠলো, গুরুদেব, শেষ হতে আর কত বাকি ?
হেসে তিনি বললেন, শেষ হয়ে এসেছে ; শেষ কথাগুলো লিখে নাও !
ছাত্র তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগলো। লেখা শেষ হয়ে গেলে সে বলে উঠলো, শেষ হ'লো ?
ঊর্ধ্বে একবার দুটি নীল চোখ তুলে বীড শান্তস্বরে বললেন, হে প্রভু, আমারও শেষ হয়েছে !
বীডের অবসন্ন দেহ হিম-শীতল হয়ে গেল।





[বহুদিন আগে বাংলাদেশে কি রকম খবরের কাগজ ছাপা হ'ত এবং তাতে প্রকাশিত সংবাদেরই বা কি ধরণ তাই জানবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একখানি বই বেরিয়েছে—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা"। বিভিন্ন সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল থেকে এইগুলি সংগ্রহ ক'রে সাজিয়েছেন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে থেকে দুটি ছোট্ট সংবাদ আমরা তোমাদের উপহার দিলুম। সংবাদ দুটি ঠিক যেমন ভাবে প্রথম ছাপা হয়েছিল, সেই রকম ভাবেই অর্থাৎ মূল ভাষা অবিকৃত রেখে এখানে ছাপা হ'ল। এতে তোমরা তখনকার সংবাদপত্রের ভাষারও পরিচয় পাবে, এবং কি রকম তখনকার দিনের জীবনযাত্রা ছিল, কত সরল এবং উঁচু মন ছিল লোকদের তারও পরিচয় পাবে। প্রথম সংবাদটি হ'ল সেই সময়কার যখন প্রথম বিলিতি সুতো এদেশে আসছে—অর্থাৎ আমাদের দেশে অন্নের অভাব প্রথম শুরু হচ্ছে। আর দ্বিতীয়টিতে তোমরা বিবাহের তখনকার দিনের সামাজিক রীতির কথা জানতে পারবে—ইতি সং]

চরকা কাটনির দরখাস্ত

শ্রীযুত সমাচার পত্রিকার মহাশয়

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনাদিগের আপন ২ সমাচার পত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণ কর্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আমার এই দরখাস্ত-পত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু

কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচগণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিন কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই, তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কয়েক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় একতোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমাদিগের অন্নবস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ২ ঐ কর্মে বড়ই নিপুণ হইলাম ক-এক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাতগণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বিতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইতে তাহার শ্রাদ্ধে এগারগণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রাসাদাৎ এত পর্যন্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়া বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাড়ীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্বাপেক্ষা সিকিদরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতী সূতা বিস্তার আমদানী হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতা হইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সে আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমা-হইতেও দুঃখিনী আর আছে। পূর্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক সব বড় মানুষ বাঙ্গালী সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমা-হইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমন দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না এ-কারণ এদেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত।—সং চং শান্তিপুর। ৫ই জানুয়ারী, ১৮২৮

মৈথিলির বিবাহ

মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে চন্দ্র-সূর্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে। তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে, যাহার ২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর দুই এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহ বা পুত্রের বিবাহার্থী কেহ বা কন্যার বিবাহার্থী কেহ বা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় একমাস তথায় বাস করে।

ইহাদিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্বারা তৎপণাপণ কোটী দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্ধার্য হয় আর যতদিন অবধারিত না হয় ততদিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে। বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমন বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটি চরকা মাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধুতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটি পান বাট্টা এক যোড়া বরযাত্র খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারিপয়সার সিন্দূর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে। বর আপন বাটী হইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্‌গ্রামের প্রান্তে পৌহুঁছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্বক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোমটা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিক্ষেপ করেন বর এমন আস্তে চলেন যে তাহার পদনিঃক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলেন যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোকে নিন্দা করে বা অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসা এই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাট্টার দ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃস্হত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহাদিগকে একপ্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটকগ্রন্থ পড়ে ও বর কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্যকোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্তামাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্র দ্বারা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বাদ্য গীতকরত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী-লোকেরা ধূনা জ্বালায় পরদিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতুহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ ধূনা জ্বালাইয়া সম্মুখে আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রীলোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুন নামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতুহল গৃহে ৭।৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন। ২৭শে মে, ১৮২৬।



সম্মানের মূল্য

সুমথনাথ ঘোষ

চিতোর! প্রতাপের সাধের চিতোর! রাজপুতদের গৌরবের চিতোর আবার অমরসিংহের হাতে এলো।

যার সাধনায়, যার কল্পনায়, যার স্বপ্নে রাণা প্রতাপসিংহ দিনরাত ডুবে থাকতেন; যে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে ও অন্ধকার পর্বতগুহায় কত দিন, কত রাত্রি, অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়ে দিয়েছেন; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দুর্দান্ত শীত, অবিশ্রান্ত বর্ষাকে উপেক্ষা ক'রে, পদদলিত ক'রে যে জন্মভূমির পবিত্র ধূলিকণা একদিন শত্রুর স্পর্শ থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই চিতোরের সিংহাসনে প্রতাপেরই উপযুক্ত পুত্র অমরসিংহ যখন বসলেন, তখন রাজপুতদের আনন্দের আর সীমা রইল না।

কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন উপভোগ করতে হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা জানতে পারলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করতে আসছেন।

রাণা অমরসিংহ পূর্বপুরুষের যুদ্ধ-প্রথা অনুসরণ না ক'রে সৈন্যসামন্ত যোগাড় করতে লাগলেন এবং সম্মুখসমরে তাঁকে বাধা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। মোগলদের আসতে বিলম্ব দেখে তিনি মনে করলেন ততক্ষণ কয়েকটা স্থান মোগলদের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনা যাক।

যুদ্ধের আয়োজন সব ঠিক; এমন সময়ে নিজেদের মধ্যে এক গোলমাল বাধল। কে সেনাদের পুরোভাগ রক্ষা করবে অর্থাৎ সৈন্যপরিচালনা করবে? এটা হলো সকলের চেয়ে বড় সম্মানের পদ। যারা শ্রেষ্ঠ বীর, মানে-মর্যাদায় যারা সকলের চেয়ে বড়, চিরকাল তারাই এই যশের অধিকারী হয়ে এসেছে। এবার এই নিয়ে রাজপুতদের মধ্যে একটা ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হলো।

চন্দাবৎগণ অর্থাৎ মহারাণা চণ্ডের বংশধরগণের মধ্যে যাঁরা জ্যেষ্ঠ, বরাবর তাঁরাই এই সম্মান পেয়ে এসেছেন। 'রাজপুত ভীষ্ম' বলে যাঁর গল্পটি এই পুস্তকের প্রথমে তোমরা পড়েছ, এঁরা তাঁরই বংশধর। আর শক্তাবৎ হলো রাণা প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহের বংশধরগণ; এরা কিন্তু এবার ক্ষেপে গেল, বললে, আমরা এই সম্মান চাই। বলার আর কোন হেতু ছিল না, শুধু এরা প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেছিল

ব'লেই দম্ভের সঙ্গে এই দাবী জানালে।

মহামুস্কিল! এখন কী হয়? দুই দলই সমান পরাক্রমশালী। রাণার ডানহাত বাঁহাত বললেই হয়—কা'কে চটাবেন? ভেবে অস্থির হলেন।

একদলকে সম্মানিত করতে গেলেই আর একদল যাবে ক্ষেপে। শেষে কি গৃহবিবাদে নিজেদের শক্তি নিজেরা ক্ষয় করবে? সামনে আসন্ন যুদ্ধ। রাণা অমরসিংহ মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেক জল্পনা-কল্পনা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

রাজপুত হলো ব্যাঘ্রের জাত। ক্ষমতার দম্ভ, বীর্যের দর্প তাদের শিরায় উপশিরায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। যায় যাক্ প্রাণ; সম্মান আগে, বীরত্বের জয়মাল্য আগে গলায় চাই। এই ভেবে দুই দলই তলোয়ার খুলে একেবারে রাণার সামনে হাজির হলো। যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হবে সে-ই পাবে এই সম্মান।

এমন সময় রাণার মাথায় এক মতলব গেল, তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, যে দল আগে অন্তলার দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে সেই পাবে 'হিরোল' রক্ষার ভার। 'হিরোল বলে সেনাদলের পুরোভাগকে।

রাজধানী থেকে ন'ক্রোশ দূরে একটা পাহাড়ের ওপর এই দুর্গ; চারিদিক কঠিন পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার রক্ষী-নিবাস, তারই ওপর থেকে সৈন্যরা পাহারা দেয়। আর এই দেওয়ালের পাদদেশ বিধৌত ক'রে চলে গেছে একটি খরস্রোতা নদী।

অন্তলার মধ্যস্থলে দুর্গরক্ষকের অট্টালিকা, সেও অতি কঠিন পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। অন্তলায় প্রবেশ করবার মাত্র একটি পথ, মাত্র একটি দরজা।

ভোর হ'তে না হ'তেই তারা ছুটলো আপন আপন সৈন্যদল নিয়ে দিক্-বিদিক্ প্রকম্পিত করতে করতে। এতদিন যে ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল, আজ যশোলিপ্সা-প্রণোদিত হয়ে তার প্রকৃত পরিচয় দেবার জন্য দুজনে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

অন্তলার দুর্গ মোগলদের অধিকৃত। যে বীর এদের হটিয়ে দিয়ে দুর্গ জয় করতে পারবে সে-ই পাবে বিজয়মাল্য, আজ তারই হাতে সমস্ত মেবারের সৈন্যদলের সম্মুখ-রক্ষণ-ভার।

প্রচণ্ড উৎসাহ ও প্রবল জিগীষা মেবারের প্রধানতম দুই সামন্তদলকে টেনে নিয়ে গেল কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায়। চারণেরা মঙ্গলগীত গেয়ে তাঁদের অভিনন্দিত করলেন, রাজপুত রমণীরা সেই সঙ্গে নিজেদের কোকিল-কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁদের দ্বিগুণ উৎসাহিত করলেন।

সকাল হলো; সূর্যদেব আকাশের গায়ে দেখা দিলেন। গাছের মাথায়, পাহাড়ের পাদদেশে আলো ছড়িয়ে পড়ল, শক্তাবৎগণ অন্তলা দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়ে শত্রুদের অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে। কিন্তু মোগলেরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঁচিলের মাথায় এসে দাঁড়াল। উভয়-দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

এদিকে ভারি বিপদ হলো। চন্দাবৎগণ পথ ভুলে এক জলাভূমির মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। দুর্গম স্থান, পথ খুঁজে না পেয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করছে, এমন সময় এক মেষপালকের সঙ্গে তাদের দেখা। সে-ই শেষে পথ দেখিয়ে তাদের অন্তলা দুর্গের কাছে নিয়ে এলো।

চন্দাবৎগণ বুদ্ধি ক'রে কতকগুলো কাঠের সিঁড়ি সঙ্গে এনেছিল। তারই সাহায্যে দুর্গের পাঁচিলে অতি অনায়াসে তারা উঠতে লাগল; কিন্তু মোগলেরা উপর থেকে লোহার বল ও বড় বড় পাথর ফেলতে লাগল তাদের ওপর এবং তারই আঘাতে চন্দাবৎ-সর্দার আহত হয়ে নীচে প'ড়ে গেলেন। ভগবান তাঁর ভাগ্যে হিরোল রক্ষার ভার লেখেন নি!

এমনি ক'রে উভয় দলের প্রচণ্ড শক্তি ব্যাহত হয়ে বার বার ফিরে আসতে লাগল।

চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ মুহূর্তের জন্য নিরস্ত হয়ে আবার ভীমবলে আক্রমণ চালাল। শত্রুদের পরাস্ত করতেই হবে।

শক্তাবৎ-সর্দার একটি প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে চড়ে এসেছিলেন, তিনি উপায়ান্তর না দেখে রুদ্ধ দুর্গ-দ্বারের দিকে হাতীকে চালিয়ে দিলেন; দারুণ চীৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করতে করতে রণমাতঙ্গ সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেই দুর্গদ্বারে অসংখ্য তীক্ষ্ণ লোহার ফলা লাগানো থাকাতে হাতীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বার বার সে গিয়ে ফিরে আসতে লাগল। দুর্গদ্বারে হাজার হাজার বর্শার শাণিত ফলক রৌদ্রে ঝলমল করে উঠলো, হাতী কিছুতেই তাতে মাথা ঠেকিয়ে ঠেলতে পারলে না। সে দ্বার আর উন্মুক্ত হলো না। ক্রমে শত শত শক্তাবৎ বীর শত্রুহস্তে প্রাণ হারাল, কিন্তু শক্তাবৎ-সর্দার কিছুতেই নিরুৎসাহ হলেন না।

অকস্মাৎ আকাশ বাতাস কম্পিত ক'রে চন্দাবৎগণের পক্ষ থেকে জয়ধ্বনি উঠল। শক্তাবৎ সর্দারের বুক কেঁপে উঠল—ওই বুঝি চন্দাবৎরা জিতল।

আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে সেই বল্লমের ফলাগুলিতে পিঠে দিয়ে দাঁড়ালেন। আর চীৎকার ক'রে মাহুতকে বললেন, শীঘ্র হাতীকে আমার দেহের ওপর দিয়ে চালিয়ে দাও, নইলে তোমার মাথা এখনি তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলব।

মাহুত একটু ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু তিনি আবার বললেন, এখনই আমার আদেশ পালন কর, তা না হ'লে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনো।

মাহুত আর মনিবের আদেশ পালন না ক'রে থাকতে পারলে না। ডাঙ্গশ দিয়ে হাতীর মাথায় এমন জোরে আঘাত করলে যে, সে ভীষণ চীৎকার করতে করতে সেই রুদ্ধ দ্বারের ওপর গিয়ে পড়ল। তার চাপে শক্তাবৎ-সর্দারের দেহ দুর্গদ্বারের সঙ্গে পিষে গেল আর সেই লৌহফলকগুলো তাঁর দেহ বিদীর্ণ ক'রে অপর দিকে বেরিয়ে পড়লো। মড় মড় ক'রে দুর্গের দ্বার ভেঙ্গে পড়লো, শক্তাবৎ-সর্দারের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

কিন্তু সৈন্যেরা তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করলে না; সর্দারের মৃতদেহ যে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে তাঁকে পদদলিত ক'রে ঝড়ের বেগে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগ ক'রেও কিন্তু শক্তাবৎ-সর্দার সেদিন সম্মান লাভ করতে পারলেন না। তাঁর সৈন্যগণ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবার আগেই চন্দাবৎ-সর্দারের মৃতদেহ নিয়ে ওপক্ষের সৈন্যেরা পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়েছিল। চন্দাবৎগণের যে জয়ধ্বনি শুনে শক্তাবৎ-সর্দার প্রাণ বিসর্জন দিলেন, এ আর কিছু নয় তারই বিজয়োল্লাস।

মোগলদের গোলার আঘাতে যখন চন্দাবৎ-সর্দারের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তখন অপর এক জন সর্দার চন্দাবৎগণের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। তার নাম 'বান্দাঠাকুর' বা 'পাগলসর্দার'। যে সকল বীর কঠোর বিপদ আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠিত হয় না, আবশ্যক হ'লে প্রচণ্ড ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করে, যাদের হৃদয়ে মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই—বান্দাঠাকুর তাদেরই অন্যতম; তিনি যেমন বীর তেমনি তেজস্বী ও নির্ভীক; চন্দাবৎ-সর্দারের মৃতদেহ যখন মাটিতে লুণ্ঠিত হতে লাগল তখন বান্দাঠাকুর একখানি উত্তরীয়ে সেই সব জড়িয়ে নিজের স্কন্ধে ভাল ক'রে বেঁধে নিলেন এবং মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাঁচিলের ওপর উঠতে লাগলেন ও শেষে সর্দারের মৃতদেহ অন্তলার দুর্গশিরে নিক্ষেপ করলেন।

হিরোল, হিরোল! ব'লে চন্দাবৎগণ চেঁচিয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে তাদের মিলিত জয়ধ্বনি অন্তলা দুর্গের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। চন্দাবৎগণ হিরোল পেলেন।

শক্তাবৎ-সর্দার লজ্জায় অধোবদন হয়ে দেশে ফিরে গেলেন।



বহির্জগতে ভারতীয় সভ্যতার দান

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ইতিহাস সবচাইতে অনাদৃত। আমরা এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস যা পড়েছি বা পড়িয়েছি তা হচ্ছে এ দেশের অতি মামুলী ধরণের রাজনৈতিক ইতিহাস। অথচ ইতিহাস হবে ছাত্রদের পক্ষে প্রধান অনুপ্রেরণার বিষয়। স্বদেশের সাহিত্য, শিল্প, কলা, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেবে ইতিহাস। রাজনৈতিক ইতিহাস যোগাবে কাঠামো মাত্র, আর সেই কাঠামোর অন্তরে থাকবে ভারতীয় সভ্যতার সুসংবদ্ধ চিত্র। সে সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলতে যে সব বিভিন্ন জাতি সহায়তা করেছে, সে ইতিহাসে তাদের প্রত্যেকের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করতে হবে। ভারতবর্ষের মাটি, জল, বায়ু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নানা জাতিসঙ্ঘ সে ইতিহাসকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং নিত্য নূতন অবদানে সে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে তা আমাদের জানতে হবে।

ভারতবর্ষ বহির্জগতের সঙ্গে যেসব যোগসূত্র স্থাপিত করেছিল এবং সেই যোগসূত্রের আকর্ষণে কালক্রমে যে এশিয়াখণ্ডের বহু জাতি ভারতীয় সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সেকথা এ ইতিহাসে স্থান পাবে। কারণ এ-দেশের মাটির সঙ্গে আমাদের সকলের সম্বন্ধই অতি নিগূঢ় ও অচ্ছেদ্য, সুতরাং এ-দেশের প্রাচীন গৌরবকাহিনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে এবং এ-দেশের সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধার চোখে না দেখলে আমাদের মন পরিপুষ্টি লাভ করতে পারবে না, সেকথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

প্রায় হাজার বছর ধরে প্রাচ্য এশিয়ার পারসিক, মঙ্গোলীয়, চীন, তিব্বতী, জাপানী, আনামী প্রভৃতি জাতির ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে ও তাদের গঠনে সহায়তা করেছে। যে সব জাতি অধুনা লুপ্ত এবং যাদের অস্তিত্ব নিবদ্ধ এমন সব নিদর্শনে যা মরুভূমির বালুকাস্তূপ বা অজ্ঞাত দেশের নিভৃত গিরিগুহা হ'তে উদ্ধার করা হয়েছে, সে সব জাতির কথা নাই-বা বললাম। বর্তমান জগতের ইতিহাসে যে সব জাতির একটা স্বতন্ত্র স্থান আছে এবং যে সব জাতি প্রাচীন সভ্যতার ধারা এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাদের মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অটুট রয়েছে। আমরা যদি সুদূর সাইবিরিয়ার মালভূমিতে মঙ্গোলীয় লামাদের নানা বৌদ্ধবিহারে অনুসন্ধান করি, তা হ'লে দেখতে পাব যে, সে সব প্রতিষ্ঠানে এখনো বহু পণ্ডিত আছেন যাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্র গভীরভাবে আলোচনা করেন, এবং সে শাস্ত্র ও ভারতীয় বৌদ্ধদর্শনে তাঁদের এমন

অধিকার ও অন্তর্দৃষ্টি আছে, যার তুলনা এখন ভারতেও নেই। অথচ এই মঙ্গোলীয় জাতি বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষালাভ করেছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে। কি ভাবে তারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল সে কথা আমাদের জানা দরকার, কারণ তা ঘটেছিল এমন একটি ধর্ম-সভায়, যাকে Convention of Religion বলা চলে। জেঙ্গিসের বংশধর কুবলাই খাঁ তখনো চীনদেশ জয় করেন নি এবং সমস্ত মধ্য-এশিয়ায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হন নি। গোবি মরুভূমির একান্তে কারাকোরাম নামক শহরে তাঁর রাজধানী এবং তাঁর রাজসভায় নানা ধর্মের প্রতিনিধি তাঁকে দীক্ষিত করবার জন্য ব্যস্ত। কুবলাই খাঁ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণের এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন এবং ঠিক করলেন যে, সেই সভায় ধর্মালোচনায় যে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হবে সেই ধর্ম তিনি গ্রহণ করবেন। সেই সভায় যোগদান করলেন—সিরিয়া হতে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধি, ইরাণ হ'তে অগ্নি-উপাসক, চীন হ'তে কনফ্যুসীয় পণ্ডিত ও তাওধর্মের প্রতিনিধি এবং তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্মের পক্ষ হ'তে বৌদ্ধ পণ্ডিত; সেই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম শাক্যপণ্ডিত, তিনি তিব্বত হ'তে গেলেও জাতিতে ছিলেন ভারতীয় আর তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর হ'লেও পাণ্ডিত্য হিসাবে তিনি ছিলেন তৎকালীন বৌদ্ধসমাজে শ্রেষ্ঠ। তিব্বত হ'তে কারাকোরাম পর্যন্ত দুর্গম পথের কষ্ট শাক্যপণ্ডিতকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি, সভায় উপস্থিত অন্যান্য ধর্মের বয়োবৃদ্ধ ও পারদর্শী পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমানও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। দিনের পর দিন নানা ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর কূটতর্ক চলল এবং অবশেষে তিনি বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন। সে ধর্মে তখন কুবলাই যে নিজেই দীক্ষা নিলেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতি সে ধর্মকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে একটি যাযাবর জাতিকে সভ্যতার কোঠায় উন্নীত করল। পরে কুবলাই খাঁ যখন অর্ধ-এশিয়ার অধীশ্বর হলেন, তখন তিনি বৌদ্ধ-ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে একটি বিশাল ধর্মরাজ্য সংগঠনের পরিকল্পনা করলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও মঙ্গোলীয় জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হ'ল; কারণ এই অবসরে বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হ'ল, আর এই গ্রন্থই হ'ল মঙ্গোলীয় জাতির একমাত্র সাহিত্য, যা হ'তে এ পর্যন্ত সে জাতি শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছে এবং বর্তমান যুগের শিক্ষাপ্রণালী সে দেশকে তার প্রাচীন আদর্শ হ'তে বিচলিত করতে পারে নি। সুতরাং তাদের দেশে যদি আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধবিহারগুলিই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আর সেই বিহারের লামা বা আচার্যেরা ব্যাকরণ, শাস্ত্র, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতির আলোচনায় এখনো প্রাচীন ভারতীয় পন্থা অনুসরণ করছেন, তা হ'লে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নাই।

এশিয়াখণ্ডের অন্য প্রান্তে জাপানী সভ্যতার সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। একথা সত্য যে, জাপানী জাতি বহু পরিমাণে বর্তমান যুগের সভ্যতা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমান জাপানের রাজনৈতিক শক্তি, তার সৈন্যসমারোহ, নৌ-বল ও বর্তমান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের চেষ্টার পেছনে যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তার সভ্যতার মর্মস্থল যদি আমরা খুঁজে বের করি, তাহ'লে দেখবো যে, জাপান ভারতীয় সভ্যতাকে বর্জন করে নি বা করতে পারে নি। বর্তমান যুগের আদর্শে গঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবার পূর্বেও, অর্থাৎ বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্তও জাপানী শিক্ষালাভ করত যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সেগুলি ছিল বৌদ্ধবিহার, আর একথা সকলেই জানে যে, প্রাচীন যুগে ভারতেও নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারগুলি এতবড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল যে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়-পদবাচ্য ধরা হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন জাপানীরা তাদের জাতিসংগঠন কার্য শুরু করে, তখনই এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়। জাপানী জাতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শোতোকু-তাইশি এই সময়ে যে রাজকীয় অনুজ্ঞা প্রচার করলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট ক'রে বললেন, 'বৌদ্ধধর্ম' হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ অবদান, সেই ধর্মই হচ্ছে অন্যান্য দেশের শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন, সুতরাং জাপানী-জাতি যদি শিক্ষিত হ'তে চায়, যদি সভ্য জাতির গোষ্ঠীভুক্ত হ'তে চায়, তা হ'লে তাকে সেই ধর্ম অবলম্বন না করলে চলবে না।' সুতরাং শোতোকুর সময় হ'তে জাপান এই ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করল। চীন দেশ হ'তে ভারতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য, ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রভৃতির অনুবাদ জাপানে প্রচার করা হ'ল ও জাপানে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠলো। বর্তমানে জাপানে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বারোটি আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সুতরাং বর্তমান জাপান নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন করে নি, এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা ক'রে আসছে, কারণ এ ভয় তাদের আছে যে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করলে তারা হয়ত নিজেদের সভ্যতার মূল সূত্রগুলি হারিয়ে ফেলবে। এই কারণে জাপানের প্রধান নগরগুলি হ'তে দূরে নিভৃত পল্লীর যে কোন বৌদ্ধ-বিহারে, নারার প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানে বা মধ্যযুগের সবচাইতে বড় প্রতিষ্ঠান কোইয়াসান পাহাড়ের উপরে কোবো দাইশির আশ্রমে আমরা যে নিষ্ঠার পরিচয় পাই, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়নে যে আন্তরিকতা দেখতে পাই এবং অধ্যাত্মসাধনায় যে অন্তর্দৃষ্টির খোঁজ পাই, তা যে ভারতীয় সভ্যতার অবদান তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে, যবদ্বীপ বা বলিদ্বীপে, কিংবা ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া ও আনামে, এবং শ্যামদেশে যে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল, সেকথা বিস্তৃত ক'রে বলবার দরকার নেই। এইসব দেশে ভারতীয় সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারিত হয়েছিল, এবং সে-সব দেশের ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে ও ধর্মে সে সভ্যতার সম্পূর্ণ প্রভাব এখনো বর্তমান।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়। তার পূর্বে সে দেশে কোন সাহিত্য, বা সাহিত্যের বাহন, লিপি ছিল না। এই সময়ে তিব্বতের প্রথম সম্রাটের আজ্ঞানুসারে তিব্বতী পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে আসেন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং দেশে ফিরে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে তিব্বতী ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখেন ও তিব্বতী ভাষার জন্য তৎকালীন ভারতীয় লিপির প্রচলন করেন। এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হ'তে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় ছ'শো বছর ধরে বহু তিব্বতী পণ্ডিত ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সমস্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেন। এই অনূদিত সাহিত্য বিপুল; তিব্বতী মুদ্রিত সংস্করণ প্রায় ৫০০০ গ্রন্থে সমাপ্ত। এই বৌদ্ধ-সাহিত্যই হচ্ছে তিব্বতের প্রধান সাহিত্য, এ ছাড়া আধুনিক কালে তিব্বতী ভাষায় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার অনুপ্রেরণাও মূলতঃ ঐ প্রাচীন সাহিত্য হ'তে এসেছে, সেগুলি হচ্ছে তিব্বতের নানা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-গ্রন্থ। বর্তমান তিব্বতের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা পরিত্যাগ করে নি, সেই কারণে বৌদ্ধ-বিহারগুলি এখনো একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তিব্বতে শিক্ষার প্রচলন হয়।

এ পর্যন্ত আমি চীন দেশের কথা বলি নি, তার কারণ চীন দেশের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল।

সেই জন্য কনফ্যুসীয় সম্প্রদায়ের চীনা পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বাধা দেন, এবং সে ধর্মের বহুল প্রচার ও প্রচার সত্ত্বেও চীনদেশে সে ধর্ম কোনদিনই রাজকীয় ধর্ম হিসাবে গৃহীত হয় নি। কিন্তু এ বাধা সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারত ও চীনদেশের মধ্যে যোগসূত্র খুব দূর ছিল না। সেই কারণে এই যুগে ভারতবর্ষ হ'তে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে যেতেন, চীনা পণ্ডিতেরাও ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সব ভারতীয় ও চীনা পণ্ডিতদের সমবেত চেষ্টায় এই যুগে সমগ্র বৌদ্ধ-সাহিত্য চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অনূদিত হয় ব'লে চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্য অতুলনীয়, কারণ তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষায় শুধু একটি মাত্র সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অনূদিত হয়েছিল। এই বিরাট চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্প্রতি জাপান হ'তে নূতন প্রকাশিত হয়েছে। এই নূতন সংস্করণ প্রায় ৬০০০ হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কালক্রমে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের বারোটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও নূতন শাস্ত্র, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি লিখিত হয়। এই সব টীকা-টিপ্পনী হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চীনা পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন আলোচনার জন্য কতটা উৎসাহী ছিলেন ও পরিশ্রম করেছিলেন।

পূর্বে যা বলেছি তা থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ, পারস্যের প্রান্তভূমি হ'তে জাপান, ও সাইবিরিয়া হ'তে ভারত মহাসাগর দীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র ভূমিভাগের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। এসব জাতির মধ্যে যারা যাযাবর, যেমন শক, তুর্কী, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি এবং যাদের কোন স্বকীয় সভ্যতা ছিল না, যেমন তিব্বতী ও ইন্দো-চীন, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশের নানা জাতি, তারা সকলেই ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের দেশের আবহাওয়ার মধ্যে সে সভ্যতাকে ক্রমশ স্বকীয় ক'রে তুলেছিল। আর যেসব জাতির একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল, যেমন চীনা, জাপানী ইত্যাদি, তারা ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু সে সভ্যতার কেবল সেই উপাদানগুলিই নিজস্ব ক'রে নিয়েছিল, যা তাদের নিজেদের সভ্যতায় ছিল না।

প্রাচ্য এশিয়াখণ্ডের শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা করলে একথা আরও স্পষ্ট হবে। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত নানা দেশে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্রহ্মদেশ হ'তে আরম্ভ ক'রে চীন, জাপান পর্যন্ত নানা দেশে যেসব বৌদ্ধমন্দির দেখি, যাকে সাধারণত পাগোদা বলা হয়, এবং যা নানাস্তরে বিন্যস্ত হয়ে নির্মিত হয়, এই মন্দিরের নির্মাণ-কৌশল যে ভারতীয়, তা সম্প্রতি নির্ধারিত হয়েছে। এসব মন্দির কাঠে নির্মিত এবং অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষেরও মন্দির এই রীতিতে কাঠে নির্মিত হ'ত, কিন্তু এ-দেশের আবহাওয়ায় কাঠের মন্দির অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয় ব'লে ক্রমশ পাথর ও ইঁটে মন্দির নির্মিত হ'তে লাগলো। প্রথম যুগের পাথরে নির্মিত মন্দিরগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সেগুলি নানাস্তরে বিন্যস্ত কাঠের মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতবর্ষের যে সব প্রদেশের আবহাওয়ায় কাঠ টিক্‌তে পেরেছে, যেমন নেপাল ও মালাবার, সে সব প্রদেশে এখনো কাঠে নির্মিত পাগোদার অনুরূপ বহু মন্দির দেখা যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের এ শিল্প প্রাচ্য দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে; চীন, জাপান সে শিল্প অতি সযত্নে রক্ষা করেছে, পরবর্তীকালে তাকে পল্লবিত ও নিজেদের আবহাওয়ার মধ্যে তাকে পরিপুষ্ট করেছে। সেইজন্য জাপানে

নানা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় সপ্তম, অষ্টক শতকের যে সব বৌদ্ধমন্দির পাই, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রীতির অনুযায়ী, পরবর্তীকালের মন্দিরগুলি ঈষৎ পরিবর্তিত।

ভাস্কর্য-চিত্রকলায় প্রাচ্য-জগৎ বহু পরিমাণে ভারতীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ধারা যে মধ্য-এশিয়ার নানা দেশ হয়ে চীন ও জাপান পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেই সব দেশেই পাওয়া যায়। চীন দেশের পশ্চিম প্রান্তে তুন-হেয়াং নামক স্থানে ও উত্তর প্রান্তে শান্-শি প্রদেশে ইউয়ান-কাং নামক স্থানে প্রাচীন যুগের দুটি বিরাট বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই দুই স্থানে গিরিগুহাগুলিকে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত করা হয়েছিল। আর সে গুহা-মন্দিরগুলির প্রাচীর চিত্রিত এবং প্রকোষ্ঠ ভাস্কর্যে সুশোভিত হয়েছিল। গুহা-মন্দিরগুলির নির্মাণ ও সুশোভিত করবার কার্যে যোগদান করেছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং চীন ও অন্যান্য দেশের—বিশেষত ভারতের শিল্পীরা। এই দুই স্থানের চিত্রকলার বিচার করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে চিত্রাঙ্কনের সেই ধারা অনুসৃত হয়েছে যা আমরা পাই অজন্তায় এবং অজন্তার অনুকরণে চিত্রিত আফগানিস্থানের বামিয়ান প্রদেশে ও মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে। ভাস্কর্যে সেই নির্মাণকৌশল পরিস্ফুট হয়েছে, যার পরিচয় পাই গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যে। ভারতীয় শিল্পের এই ধারা চীন হ'তে জাপান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। নারার নিকটবর্তী হোরিউ-জি নামক বৌদ্ধমন্দিরে আমরা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের যে চিত্র পাই, তা সর্বতোভাবে অজন্তার আদর্শ ও চিত্রণ-কৌশল গ্রহণ করেছে এবং কোইয়া-সান্ মন্দিরে যেসব বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি আছে, তার মধ্যেও গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

অন্যদিকে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন রাজধানী এঙ্কোরের এঙ্কোরভাট ও যবদ্বীপের বোরো-বোদোর মন্দিরের নাম আমরা সকলেই শুনেছি। এঙ্কোরভাট খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের বিষ্ণুমন্দির ; বোরো-বোদোর বৌদ্ধমন্দির এঙ্কোরভাটের কিছু পূর্বে নির্মিত। এ দুই মন্দিরের তুলনা ভারতবর্ষেও দুর্লভ। এঙ্কোরভাট, বোরো-বোদোরের বিরাট পরিকল্পনা দেখে ইউরোপীয় আমেরিকান পণ্ডিতেরা বিস্মিত হয়েছেন এবং প্রতিবৎসর বহু বিদেশী এইসব মন্দির দেখতে সেসব দেশে যান। এই দুই মন্দিরের শুধু পরিকল্পনা কেন, তাদের নির্মাণকৌশল, প্রাচীরগাত্রে খোদিত রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি গল্পের অসংখ্য চিত্রাবলী, আর্টের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই মন্দিরগুলি সে সব দেশে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভারত চীন, তিব্বত, জাপান, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি দেশকে বিরাট বৌদ্ধসাহিত্য দান করেছে, তা ছাড়া সেই সব দেশের সাহিত্যের অন্য দিকেও ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীন সাহিত্যে প্রথম নাটক রচিত হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আর সে নাটকের নাম 'বোধিসত্ত্বমালা'। এ নাটক ভারতীয় নাটকের অনুকরণে রচিত। সুতরাং নাটক রচনায় চীনা সাহিত্যিকেরা প্রথম অনুপ্রেরণা পান ভারতীয় সাহিত্য হ'তে। জাপানের বিখ্যাত 'নো'-নৃত্যের অনুপ্রেরণাও সেই উৎস হ'তে। 'নো' কথা নাট্য শব্দের রূপান্তর, এবং নো-নৃত্যের মধ্যে ভারতীয় 'যাত্রা'র প্রভাব স্পষ্ট ধরা যায়। ভারতবর্ষে যাত্রা লুপ্তপ্রায়, অনাদৃত। অথচ জাপানে 'নো' নৃত্য দেখবার জন্য শুধু যে জাপানীরা তা নয়, ইউরোপ ও আমেরিকা হ'তে নবাগত বহু বিদেশী পাগল।

বহির্জগতের সভ্যতার সংগঠনে ভারতীয় সংস্কৃতির এই অবদানের ইতিহাসের দু'একটি কথা অতি

সংক্ষেপে বলতে হয়। তার কারণ শিক্ষক ও ঐতিহাসিক সকলেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই গরিমাময় অধ্যায়কে অবহেলা করেছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে হ'লে এদিকে যে আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক তা'তে সন্দেহ নাই। কারণ বহির্জগৎ ভারতবর্ষ হ'তে যে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান পেয়েছে ও সযত্নে রক্ষা করেছে আমরা বহু পরিমাণে তা হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার সেই সব লুপ্ত রত্ন ফিরিয়ে আনতে পারলে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে এবং সেই ইতিহাস হবে ছাত্রদের প্রধান অনুপ্রেরণার বিষয় ও জাতি সংগঠনের প্রকৃত সহায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সঙ্ঘশাসন-পদ্ধতির জন্ম পাশ্চাত্ত্য দেশেই। প্রাচীন গ্রীসের ছোট ছোট পৌর-রাষ্ট্রসমূহে (City-states) এই প্রকার শাসনবিধি অবিদিত ছিল না। তাহার পর মধ্যযুগে ইতালির অন্তর্গত অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য এইরূপ শাসনের অধীন ছিল। আধুনিক য়ুরোপে Switzerland দেশে এই শাসন-প্রণালী সর্বপ্রথম পরীক্ষিত হয়। Switzerland-এর পর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ও তদবধি এই রাজ্যেই এই প্রকার শাসনের প্রধান দৃষ্টান্ত থাকিয়া গিয়াছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানিতে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক জার্মানির ভাগ্যবিধাতা হের হিটলারের আবির্ভাবের পর এই ব্যবস্থার অবসান হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ উপনিবেশ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সাউথ আফ্রিকা এবং মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইন রিপাবলিক, ব্রেজিল ইত্যাদি রাষ্ট্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গণতন্ত্র রাষ্ট্রশাসনের দুই প্রকার রূপ রাজনীতি-শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়। প্রথম, 'একাত্মক' (unitary) শাসন-প্রণালী ও দ্বিতীয়ত সংঘাত্মক (federal) প্রণালী। যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রেই সম্পূর্ণ শাসন-শক্তি নিহিত থাকে এবং স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র হইতে নিজের অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই রাষ্ট্রকে রাজনীতিশাস্ত্রের ভাষায় 'একাত্মক প্রণালী'র নিয়মাধীন বলা যাইতে পারে। এইরূপ রাষ্ট্রে 'স্থানীয় সরকার'-কে (Local government) নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের (Central government) উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রকার শাসনের বিশেষত্ব এই যে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলির (organs of government) মধ্যে কোনও পূর্ব-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিধানানুসারে (constitutional) শাসনাধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় না। এরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'একাত্মক' শাসনে শক্তির মূলাধার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ করা হয়। যেমন আমাদের দেশের ম্যুনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন শক্তি নাই। তাহারা কেন্দ্রীয় শাসন হইতে লব্ধ অধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন ইচ্ছা তাদের ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ যদিও তাহাদের ক্ষমতা পরিচালনের একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র বা মণ্ডলী থাকে, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই এই ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই এই ক্ষেত্রের ইচ্ছামত সঙ্কোচ-

প্রসার বা পরিবর্তন করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার সদাসর্বদা তাহাদের শাসন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

য়ুরোপ ও এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই শ্রেণীর রাষ্ট্র পাওয়া যায়। গ্রেট ব্রিটেনে 'একাত্মক' শাসনবিধি প্রচলিত আছে। এই দেশে county ও borough-গুলির প্রভূত শাসন-ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই ক্ষমতা জনসভার নিয়মানুসারে প্রাপ্ত ও তাহারই ইচ্ছানুসারে সদাসর্বদা ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। একাত্মক শাসনপ্রণালীর প্রধান উদাহরণ ফ্রান্স। এই রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভুত্ব প্রাদেশিক শাসনের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এখন দেখা যাক 'সংঘাত্মক শাসন-প্রণালী' কাহাকে বলে। যে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা এরূপ যে, তাহার সমগ্র শাসন-শক্তি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে প্রথম হইতেই নির্দিষ্ট রাজবিধান (constitution) অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, সে রাষ্ট্রকে সংযুক্ত বা সংঘাত্মক শাসনপ্রণালীর অধীন বলা যাইতে পারে। এই প্রকার শাসনে প্রান্তীয় বা প্রাদেশিক (Provincial) শাসক-সম্প্রদায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে না। প্রান্তীয় সরকারের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকে। তাহার স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালনের ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত করে না। এই ক্ষেত্র পূর্ব-নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই কারণে, বলা যাইতে পারে যে, সংযুক্ত শাসনবিধিতে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসন এক সামান্য বা সাধারণ প্রভুত্ব-শক্তির অধীন থাকিয়াও নিজ নিজ অধিকৃত সীমায় বলবৎ থাকে। অতএব সংযুক্ত শাসন এক প্রকারের দ্বৈত-শাসন। ইহাতে স্থানীয় শাসনের প্রাদেশিক ক্ষেত্র কেবলমাত্র শাসন-সৌকর্যের নিমিত্তই নির্দিষ্ট হয় না। এ ক্ষেত্র 'একাত্মক' শাসনবিধির 'জেলা বোর্ড' বা ম্যুনিসিপালিটির ন্যায় না হইয়া স্বয়ং প্রধান রাষ্ট্রমণ্ডলের আকার ধারণ করে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সয়কারের মধ্যে একটি সংযোগসূত্র বর্তমান থাকে।

উপযুক্ত শাসনবিধি প্রচলিত হইলে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের রূপ ধারণ করে। সঙ্ঘ বলিতে সংহতি বুঝায়। রাষ্ট্র যদি আংশিক ভাবে স্বতন্ত্র দেশের সম্মেলনের দ্বারা নির্মিত হয়, তবে তাহাকে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বলিতে হইবে। এইবার দেখা যাক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ কি প্রকারে স্থাপিত হয়। রাজনীতিশাস্ত্রের আচার্যেরা বলিয়া থাকেন যে, যদি কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র এক সাধারণ প্রভুত্ব-শক্তির অধীনে সম্মিলিত হইয়া কতিপয় মুখ্য মুখ্য শাসন-বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র স্থাপিত করে, তবে একটি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। অথবা যদি কতিপয় পরাধীন দেশ, স্বামী বা প্রভুর (sovereign) ইচ্ছায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার-প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

উপরিউক্ত দুই প্রকার রাষ্ট্র-সঙ্ঘেরই উদাহরণ পাওয়া যায়। আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র-সঙ্ঘ প্রথম প্রকার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রধান উদাহরণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র, যাহারা প্রথমে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রেজিল, কানাডা, মেক্সিকো, আর্জেণ্টাইন রিপাবলিক ও ভেনেজ্যুয়ালা ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রকার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদাহরণ। Switzerland এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জর্মনি প্রথম প্রকার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদাহরণ।

রাজনীতি-শাস্ত্রের প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপক ডাইসির (Diecy) কথানুসারে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ নির্মাণের জন্য দুইটি সর্ত থাকা আবশ্যক ; এই দুইটি সর্তের অভাবে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। প্রথমত কতকগুলি দেশ এমন থাকা চাই, যাহাদের মধ্যে অনন্ত ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জাতীয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। এই সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ হইবে যেন সেই দেশগুলির জনসাধারণ নিজদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া মনে করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশবাসীদিগের মধ্যে একটি বিচিত্র মনোভাব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক ; সেই ভাবটিকে ইংরেজী ভাষায় federal sentiment অর্থাৎ 'সঙ্ঘাত্মক ভাব' বলা হয়। অর্থাৎ দেশগুলির মধ্যে সঙ্ঘীভূত হইবার ইচ্ছা থাকিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে এক-রাষ্ট্রাধীন হইবার ইচ্ছা থাকিবে না। সম্মিলিত হওয়া অথচ পৃথক থাকা—ঐক্য এবং বিভিন্নতা—এই দুইটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের একত্র সমাবেশ, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের একটি প্রধান লক্ষণ।

এইবার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কতকগুলি বিশেষত্বের আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের একটি সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ কেন্দ্রীয় রাজ্যব্যবস্থা (constitution) থাকা অতিশয় আবশ্যক। এই রাজ্যব্যবস্থা rigid হইবে অর্থাৎ তাহার সহজে পরিবর্তন হইবে না। এই রাজ্যব্যবস্থা সমুদয় সঙ্ঘ ও তাহার অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে। এই রাজ্যব্যবস্থাই হইবে দেশের সর্বপ্রধান আইন। প্রাদেশিক রাজ্যব্যবস্থা অপেক্ষা কেন্দ্রীয় রাজ্যব্যবস্থা অধিকতর মান্য হইবে। নচেৎ সঙ্ঘের রক্ষা সম্ভবপর হইবে না। অধ্যাপক ডাইসির মতানুসারে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আধার যেন একটি জটিল সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত। অতএব এই সন্ধির সর্তগুলির রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এইজন্য একটি লিপিবদ্ধ শাসন-সম্পর্কিত নিয়মাবলী থাকা উচিত। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, এই নিয়মপত্র এমন সুদৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় হইবে যে, কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার বিশেষ দরকার না হইলে ইহাকে বদলাইতে সমর্থ হইবে না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র-সঙ্ঘে রাজ্য নিয়মসম্বন্ধীয় বাদ-বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য একজন মধ্যস্থ থাকা প্রয়োজন। যেখানেই শক্তি-সংবিভাগ, সেইখানেই ঝগড়া-বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সকারের শক্তি-সঞ্চালনের ক্ষেত্র পৃথক পৃথক একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, অতএব প্রত্যেককেই নিজ নিজ সীমাতে আবদ্ধ রাখিবার জন্য একজন নিয়ামকের আবশ্যক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেহ কাহারও সীমার ভিতর অনধিকার প্রবেশ করিবে না। অথচ অনেক সময় শক্তিবিভাগের সীমা-রেখা এত অস্পষ্ট থাকে যে, কখন সীমা উল্লঙ্ঘিত হইল, কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার প্রয়োজন। সাধারণত এই মধ্যস্থতার কার্য 'ন্যায়-সভা' (courts) দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ ন্যায়সভা সুপ্রীম কোর্টের, প্রান্তীয় প্রতিনিধিসভা বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রচলিত আইনকে অগ্রাহ্য বা রদ্ করিবার ক্ষমতা আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা বলিতে পারেন যে, কোনও একটি বিশেষ আইন রাজ্যসম্বন্ধীয় নিয়মপত্রের (constitution) বিরুদ্ধে।

কথা হইতেছে যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘে কোনও একটি সংস্থা (organ of government) এমন নাই যাহার প্রভুত্বশক্তি পূর্ণ বা অখণ্ডিত। সকলেরই শক্তি সীমাবদ্ধ এবং এই সীমা রাষ্ট্রীয় নিয়মপত্রের দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও একটি শাসনবিভাগ নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করে তবে

কে তাহা নিবারণ করিবে? উত্তর হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে ন্যায়-সভাগুলি আছে তাহাদের সকলেরই এই ক্ষমতা থাকা উচিত এবং সর্বোচ্চ ন্যায়সভার চরম সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষেত্র ভিন্ন নহে। অতএব এখানে ঝগড়া-বিবাদের কোনই আশঙ্কা নাই এবং সেইজন্য আপোস করিবার জন্য কোনও মধ্যস্থেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। এখানে কমন্স-সভার দ্বারা যে কোনও আইন প্রচলিত হউক না কেন, ন্যায়-বিচারালয়গুলি তৎক্ষণাৎ তাহা মানিয়া লয়। এই নীতিকে 'ব্যবস্থাপক সভার প্রধানতার নীতি' বা Principle of Legislative Supremacy কহে এবং অন্য নীতিকে (অর্থাৎ ন্যায়-সভার আইন অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাকে) 'ন্যায়-সভার প্রধানতা' বা Principle of Judicial Supremacy কহে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের তৃতীয় বিশেষত্ব উপরের আলোচনা হইতেই স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। উপরেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মূল ভিত্তিই হইল শক্তি-সংবিভাগ। এই শক্তি-সংবিভাগ না হইলে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে সমস্ত শাসনাধিকার সমর্পিত হয় তাহাদের দ্বারাই প্রান্তীয় সরকারের অধিকার স্বতই সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কতকগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপক-সভা (Congress), প্রধান কার্যকর্তা (President), ও ন্যায়াধিকারের (Supreme Court) মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত অধিকার—যাহা রাজ্যব্যবস্থার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় নাই—প্রাদেশিক শাসনের হস্তেই থাকিয়া গিয়াছে।

উপরিউক্ত তিনটি বিশেষত্ব ছাড়া আরও কয়েকটি লক্ষণ রাষ্ট্র-সঙ্ঘে পাওয়া যায়। এই প্রকার রাষ্ট্রে রাজস্ব-সম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের উভয়েরই শাসনকার্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের জন্য উভয়কে একই প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে হইবে এবং উভয়েরই এ বিষয়ে স্বাধীন ক্ষমতা আছে। অতএব প্রশ্ন উঠিতেছে, কোন্ কোন্ করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করিবেন ও কোন্‌গুলি প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার। উভয় সরকারকেই ব্যয়ের কথা মনে রাখিয়া এই আয়-বিভাগ করিতে হইবে। অবশ্য ব্যয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সে হিসাবে আয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন—কিন্তু ইহা মোটেই সহজ নহে।

আর একটি কথা, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি নিজ নিজ স্বাধীনতার কিয়দংশ হারাইয়া তবে সঙ্ঘাকারে সংযুক্ত হইয়া থাকে। যাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকে, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক বলবান্ হইয়া তাহাদের শক্তিকে অন্যায়ভাবে খর্ব করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'ন্যায়-সভার প্রধানতা'র দ্বারা এই সংরক্ষণকার্য সাধিত হয়। তাহা ছাড়া আরও সাবধানতার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত 'প্রতিবিধান' (Representation) দিতে হইবে। প্রত্যেক অংশের, তা যে যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমান প্রতিনিধিত্ব দিতে হইবে, অবশ্য মহাসভা বা Parliament-এর 'নিম্ন' বিভাগে (Lower Chamber-এ) এই সমান প্রতিনিধিত্ব সম্ভবপর নহে। কারণ, এই নিম্ন প্রতিনিধি-সভায় রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি তাহাদের লোক-সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পাইবে। অতএব এই সমান প্রতিনিধিত্বের নীতি দ্বিতীয় বা উচ্চতর বিভাগেই (Second বা Upper Chamber-

এই) কার্যকরী হইতে পারে। মহাসভার দ্বিতীয় বিভাগে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত অংশগুলিরই সমান সংখ্যক প্রতিনিধি যাইবে। তবেই তাহাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকিবে এবং বৃহৎ প্রদেশগুলি ক্ষুদ্রগুলিকে নিজেদের প্রবলতর শক্তির দ্বারা অতিক্রম বা পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে 'রাষ্ট্র' নামে অভিহিত করা উচিত নহে। কারণ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন হয় না। আবার কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থাগুলিতেও প্রভুত্বশক্তি থাকে না। তবে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রভুত্বশক্তি কোথায় থাকে? প্রভুত্বশক্তি কেন্দ্র ও প্রান্ত হইতে পৃথক সমস্ত জনতার মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু জনতা তো প্রভুত্বশক্তিকে সদাসর্বদা প্রয়োগ করিতে পারে না; অতএব এই প্রভুত্বশক্তি সেই শাসন-সংস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে যাহা রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করিতে সমর্থ। সমস্ত রাষ্ট্র-সঙ্ঘে কোনও না কোনও এমন একটি রাজ্যসংস্থা থাকে যাহা শাসন-ব্যবস্থার (Constitution-এর) মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কোন অংশের সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইবার ক্ষমতা নাই। একবার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলে সঙ্ঘ হইতে পৃথক হইবার উপায় থাকে না। কারণ রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বস্তুত একটি সমুদয় রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের কোনও অংশের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইবার ক্ষমতা কি করিয়া থাকিতে পারে? বিচ্যুত হওয়া মানে তো বিদ্রোহ করা। কোন রাষ্ট্রই বিদ্রোহের প্রশ্রয় দিতে পারে না।

স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে শাসন অধিকারে ভাগ-বাঁটোয়ারার সচরাচর একটি মূলনীতি অনুসৃত হয়। যে সমস্ত বিষয়ে সর্বসাধারণের সম্বন্ধ থাকে এবং যাহা অত্যন্ত আবশ্যক এবং যাহাতে আইনের ঐক্য (uniformity) দরকার সেইগুলি কেন্দ্রে সমর্পিত হয়। এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলিতে স্থানীয় সরকারের অধিকার অটুট থাকে। সচরাচর রাষ্ট্র-সঙ্ঘে পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ, সন্ধি-বিগ্রহ, অন্ত-প্রান্তীয় বাণিজ্য, মুদ্রা সম্বন্ধীয় বিধিবিধান, নবীন আবিষ্কার এবং নব প্রকাশিত গ্রন্থের সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করিবার অধিকার, বাণিজ্যশুল্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন থাকে। অন্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কোনও অংশের কোনই অধিকার থাকে না।

শক্তি-সংবিভাগ করিবার জন্য দুইটি পন্থা অনুসৃত হইতে পারে। অধিকতর রাষ্ট্র-সঙ্ঘে কেন্দ্রীয় শাসনের অধিকারগুলি শাসনবিষয়ক নিয়মপত্রে (constitution) নাম করা থাকে। অবশিষ্ট অধিকারগুলি স্থানীয় সরকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারগুলি 'সমর্পিত' (delegated) হয় ও স্থানীয় সরকারের অধিকারগুলি 'অবশিষ্ট' (residuary) হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার-সীমা বিধানপূর্বক (positively) নির্দিষ্ট হয় এবং স্থানীয় সরকারের অধিকারগুলি নিষেধাত্মকরূপে (negatively) স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি রাষ্ট্র-সঙ্ঘে স্থানীয় সরকারগুলির শাসনাধিকার ব্যক্ত করা থাকে ও কেন্দ্রীয় শাসনের অবশিষ্ট অধিকার থাকে। এই শেষোক্ত সঙ্ঘের উদাহরণ Canada-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের স্বরূপ কি, তাহা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবেচিত হইল। আমাদের দেশে এই সঙ্ঘাত্মক শাসনের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু নূতন ভারত-আইনে, উপরে বর্ণিত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। তোমরা আরও বড় হইয়া সে-সব কথা পড়িবে।